



মাসিক
আলোকধারা

তাসাওউফ বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

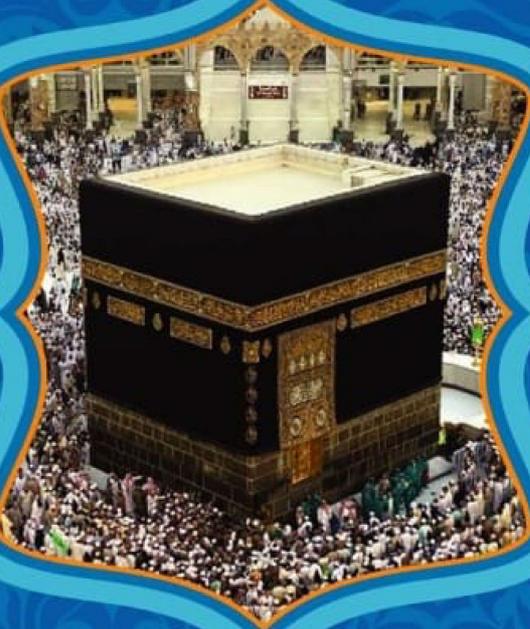
রেজিঃ নং চ-২৭২

২৬তম বর্ষ

৭ম সংখ্যা

জুলাই ২০২০ ইসলামী

লাকাইক আল্লাহুমা লাকাইক



একনজরে

বাংলাদেশে প্রবর্তিত একমাত্র তুরিকা, বিশ্বসমাদৃত 'তুরিকা-ই-মাইজভাণ্ডারীয়া'র প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এর ১১৪তম উরস শরিফ উদযাপন:



গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী'র (ক.) ১১৪তম উরস শরিফ উপলক্ষে তাঁর রওজা শরিফে মুনাযাত পরিচালনা করছেন আওলাদে গাউসুল আযম রাহবারে আলম হযরত আলহাজ্ব সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)।



২০ জানুয়ারি ২০২০ চতুর্থ প্রেসক্লাব 'বঙ্গবন্ধু হল'-এ 'মাইজভাণ্ডারী একাডেমি' আয়োজিত 'আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মিলন'।



১৬ জানুয়ারি ২০২০ 'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট' নিয়ন্ত্রণাধীন মহিলাদের আত্মজিজ্ঞাসা ও জ্ঞানানুশীলনমূলক সংগঠন 'দি মেসেজ' আয়োজিত 'পবিত্র কুরআনের আলোকে রাসূল (দ.)-এর মর্যাদা' শীর্ষক মহিলা মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এ এস এম বোরহান উদ্দিন।



১২ জানুয়ারি ফটিকছড়ি উপজেলা প্রশাসনের সাথে মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মন্ডল সম্মেলন কক্ষে ইউএনও মোহাম্মদ সায়েদুল আরেফিন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'সমন্বয় সভা'য় বক্তব্য রাখছেন গাউসিয়া হক মন্ডলের সম্মানিত সাজ্জাদানশীন ও এস জেড এইচ এম ট্রাস্টের মাননীয় ম্যানেজিং ট্রাস্টি আলহাজ্ব সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)।



উরস শরিফ উপলক্ষে ১৬ জানুয়ারি ২০২০ বা'দ মাগরিব মাইজভাণ্ডার শরিফ শাহী ময়দানে মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মন্ডলের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত 'তাজকেরা-এ-চেরাগে উম্মতে আহমদী (দ:)' মাহফিলে প্রধান মেহমানের অভিভাষণ প্রদান করছেন সাজ্জাদানশীন রাহবারে আলম হযরত আলহাজ্ব শাহসুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)।



১৫ জানুয়ারি ২০২০ ফটিকছড়ি উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে এ উপলক্ষে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প আয়োজিত "১৮তম দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম-২০২০"-এর আওতায় 'আত্মকর্মসংস্থানমূলক সামগ্রী ও নগদ অর্থ' সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে ফটিকছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান হোসাইন মোহাম্মদ আবু তৈয়ব ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সায়েদুল আরেফিন।

মাসিক আলোকধারা

THE ALOKDHARA
A MONTHLY JOURNAL OF
TASAWWUF STUDIES

রেজি. নং চ ২৭২, ২৬তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

জুলাই ২০২০ ঈসায়ী
জিলক্বদ-জিলহজ্জ ১৪৪২ হিজরী
আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৭ বাংলা

প্রকাশক

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র রক্ত ও
তুরিকতের উত্তরাধিকার সূত্রে এবং অছিয়ে গাউসুল
আযম মাইজভাণ্ডারী প্রদত্ত দলিলমূলে, গাউসুল
আযম মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরিফের খেদমতের
হকদার, তাঁর স্মৃতি বিজড়িত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের
হকদার, শাহী ময়দান ব্যবস্থাপনার হকদার-
মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মন্জিলের
সাজ্জাদানশীন

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

সম্পাদক

ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ

যোগাযোগ:

লেখা সংক্রান্ত: ০১৭৫১ ৭৪০১০৬
০১৭১৬ ৩৮৫০৫২
মুদ্রণ ও প্রচার সংক্রান্ত: ০১৮১৯ ৩৮০৮৫০
০১৭১১ ৩৩৫৬৯১

মূল্য : ২০ টাকা \$=2

সম্পাদকীয় যোগাযোগ:

দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
সৈয়দ সলিমুল্লাহ শাহ রোড, বিবিরহাট
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৪২১১। ফোন: ০৩১-২৫৫৪৩২৬-৭



এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট-এর পক্ষে
মাইজভাণ্ডারী একাডেমি প্রকাশনা

Web: www.sufimaizbhandari.org.bd
E-mail: sufialokdhara@gmail.com

সূচী

- সম্পাদকীয় ----- ২
- আওলাদে রাসূল (দ.), রাহবারে আলম হযরত শাহসুফি
আলহাজ্জ সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.) (মওলা
হযুর) প্রদত্ত অভিভাষণ ও আশিস বাণীশুচ্ছ ----- ৩
- বেলায়তে মোত্লাকা
খাদেমুল ফোকারা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
যুগ বিবর্তন : শৃঙ্খলিত ও অর্গলমুক্ত বেলায়ত ----- ১৫
- মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর তাসাওউফ
অধ্যাপক জহুর উল আলম ----- ১৭
- উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা.)
মো: গোলাম রসূল ----- ২৪
- পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে উত্তরণের উপায় : প্রসঙ্গ
মহামারি
মাওলানা এস এম এম সেলিম উল্লাহ ----- ২৬
- মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে উভ্ভীয়মান
স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা
মোঃ মাহবুব উল আলম ----- ৩০
- তাওহীদের সূর্য: মাইজভাণ্ডার শরিফ ও বেলায়তে মোত্লাকার
উৎস সন্ধানে
জাবেদ বিন আলম ----- ৩২
- ইউসুফে সানি, গুলে গোলাব হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ
গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক.)
আলোকধারা বিশেষ প্রতিবেদন ----- ৩৭
- সোনালী অতীতের কুশলী নির্মাতা
শায়খ আবু আবদুর রহমান আস্ সুলামী (রহ.)
মূল আরবি থেকে অনুবাদ : আহমেদ জোবায়ের ----- ৩৯
- ফীহি মা ফীহি
অনুবাদক কাজী মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন ----- ৪৩
- হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) দুই ময়না:
'বাচা ময়না' ও 'দেলা ময়না'
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ----- ৪৪
- শিশু-কিশোর মাহফিল
শ্রদ্ধা: মানুষের অনুপম চরিত্রের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ ----- ৪৭
- মহামারি করোনা ॥ এবারের হজ ও বিশ্ব পরিস্থিতি
আলোকধারা প্রতিবেদন ----- ৪৮

সম্পাদকীয়

একটি গভীর তাৎপর্য ও বিশ্বমানবতার নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ এবারের মাসিক আলোকধারা'র এই সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করেছে। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মওলা হুজুর (ম.) শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্টের মাননীয় ম্যানেজিং ট্রাস্টি, তুরিকায় মাইজভাণ্ডারীর বিশ্ব সমাদৃত শাইখ হযরত শাহসুফি আলহাজ্জ সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.) প্রদত্ত ১০টি দিক-নির্দেশনাময় অভিভাষণ ও বাণীগুচ্ছ এই সংখ্যার গুরুত্বকে অসীম করে দিয়েছে। বিভিন্ন পবিত্র মাহফিল, উপলক্ষ ও প্রকাশনাকে কেন্দ্র করে তাঁর প্রদত্ত ভাষণের প্রতি ছত্রে ছত্রে আমাদের সংকটসমূহ উঠে এসেছে। পাশাপাশি সেগুলো থেকে উত্তরণে তিনি দিয়েছেন সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশনা। বর্তমান সময়ের সংকটকবলিত বিশ্বব্যবস্থায় মুক্তির পথ খুঁজে পেতে তিনি যে উপায় বলে দিচ্ছেন, তাকে বলা চলে মহাসংস্কারের আলো। তাঁর অভিভাষণের সারকথা 'ইতিবাচক ঐক্য' এবং যুগের নিরিখে ধর্মের অধ্যাত্ম ও জীবনবাস্তবতার রূপরেখা প্রণয়ন। শুধু মুসলমান নয় দ্বিধাগ্রস্ত-সংকুচিত-পর্যুদস্ত বিশ্বমানবতা এই পথে উঠে দাঁড়াতে পারবে।

মহান ২২ চৈত্র ১৪২৬ বাংলা, মাইজভাণ্ডার শরিফের অন্যতম আধ্যাত্মিক সাধক গাউসুল আযম বিলবিরাসত হযরত মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক.) পবিত্র উরস উপলক্ষে একটি লেখা নিবেদিত হলো এই সংখ্যায়। অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী, মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার তাত্ত্বিক উন্মোচক, রুহানি ভাষ্যকার, সুলতানুল ওলি, খাদেমুল ফোকারা হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রণীত মহানগ্রন্থ 'বেলায়তে মোতলাকা'র তৃতীয় পরিচ্ছেদের সম্পূর্ণটা সারানুবাদ আকারে বাংলা ভাষার সাধুরীতি থেকে চলতি রীতিতে রূপান্তরিত হয়ে এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। এই গ্রন্থের নানা পর্যায়ে মহান লেখকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের নানা পর্যায়ে ইলহামের আলোকচ্ছটা টের পাওয়া যায়। যা এই মহান ওলির ভাষ্য-বর্ণনাকে অশেষ জ্ঞানসৌকর্যে অভিষিক্ত করেছে।

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দ.)-এর তাসাওউফ শীর্ষক অধ্যাপক জহুর উল আলমের রচনাটি এই সংখ্যায় পত্রস্থ হলো মহানবী (দ.)-এর জীবনের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী নিয়ে।

উম্মতকুলের পবিত্র মাতা, মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দ.)-এর পবিত্র সহধর্মিনীদের উপর ধারাবাহিক রচনার অংশ হিসেবে বিশিষ্ট লেখক মোঃ গোলাম রসুল রচিত 'হযরত সাওদা (রা.)', এই সংখ্যায় প্রকাশিত হলো। এই লেখাটি নিছক জীবনী নয়, এর সাথে অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য সংযুক্ত হয়ে লেখাটির গুরুত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে এবং মুক্তিযুদ্ধে মাইজভাণ্ডার শরিফের ভূমিকার অনন্য স্মৃতি নিয়ে রচিত মোঃ মাহবুব উল আলমের একটি লেখা এই সংখ্যায় সংকলিত হলো।

এই সংখ্যাতেই পত্রস্থ হলো মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যের ইতিহাস

বিষয়ক রচনা 'শত বছরের মাইজভাণ্ডারী সাহিত্য', কাজী মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন অনুদিত আল্লামা রুমি (র.)-এর রচনা 'ফীহি মা ফীহি' যথারীতি প্রকাশিত হলো। সেই সাথে থাকছে শিশু-কিশোর মাহফিল এবং সাম্প্রতিক আলোচ্য প্রসঙ্গ। সামগ্রিকভাবে মাসিক আলোকধারা বিশ্বপরিস্থিতির দিকেও সজাগদৃষ্টি রাখছে। এ উপলক্ষে এক দিক নির্দেশনায় রাহবারে আলম পরম শ্রদ্ধেয় মওলা হুজুর (ম.) বলেন, 'আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশও আজ কোভিড-১৯ মহামারীর ছোবলে। এই ভয়ানক বিপদ থেকে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে আমাদের আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক উভয়দিকের প্রতিকারের উদ্যোগ নিতে হবে। এ লক্ষ্যে আমাদের-তওবা ইস্তেগফার, আল্লাহর ছানা, রাসূলের (দ.) প্রতি দরুদ, ইবাদত বন্দেগীতে ব্রতী হতে হবে ব্যক্তিগতভাবে।'

তুরিকা-ই মাইজভাণ্ডারীর প্রতিষ্ঠাতা গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবার পৌত্র ও স্থলাভিষিক্ত, মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার স্বরূপ উন্মোচক আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদেমুল ফোকারা হযরত অছিয়ে গাউসুল আযম মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র সহধর্মিনী, গাউসুল আযম বিল বিরাসত কুতবুল আকতাব বাবা ভাণ্ডারী (ক.)'র অতি স্নেহের কনিষ্ঠ কন্যা, শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র সম্মানিত আন্মাজান, হযরত শাহযাদী সৈয়দা সাজেদা খাতুন মাইজভাণ্ডারী (র.)'র ৫২তম বেসাল শরিফ দিবস উপলক্ষে ফাতেহা শরিফ গাউসিয়া হক মনজিলে অনুষ্ঠিত হয় গত মহান ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ৬ জুন।

ফাতেহা শরিফে সদারত করেন গাউসিয়া হক মনজিলের সম্মানিত সাজ্জাদানশীন, আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাহবারে আলম শাহসুফি হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)।

একই সাথে সম্প্রতি লোকান্তরিত ইমামে আহলে সুনাত মাওলানা কাজি নুরুল ইসলাম হাশেমী (রঃ)'র চাহরম উপলক্ষে বিশেষ দোয়া করা হয়।

এই মিলাদ মাহফিলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্ববাসীকে বর্তমান কঠিন দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণের জন্য মোনাজাত করা হয়।

আলোকধারার এই সংখ্যায় প্রকাশিত আরো গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীর মধ্যে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে উত্তরণের উপায় : প্রসঙ্গ মহামারি, ধারাবাহিক রচনা তাওহীদের সূর্য। মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ ও বেলায়তে মোতলাকার উৎস সন্ধানে, ইউসুফে সানি, গুলে গোলাব হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক.), বিশ্ববিখ্যাত শায়খ আবু আবদুর রহমান আস্ সুলামী (রহ.)-এর জীবনালেখ্য, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) দুই ময়না : 'বাচা ময়না' ও 'দেলা ময়না' এবং আলোকধারা প্রতিবেদন মহামারি করোনা ॥ এবারের হজ ও বিশ্ব পরিস্থিতি ইত্যাদি রচনা, সমগ্র সংখ্যায় ব্যাপক বিষয় বৈচিত্র্য এনেছে।

আওলাদে রাসূল (দ.), রাহ্বারে আলম হযরত শাহসুফি আলহাজ্জ সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.) (মওলা হুযুর) প্রদত্ত অভিভাষণ ও আশিস বাণী

‘তুরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীয়া’র প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) প্র-প্রপৌত্র, ‘তুরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীয়া’র বিশ্বসমাদৃত শাইখ ও মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ ‘গাউসিয়া হক মনজিল’ এর সম্মানিত সাজ্জাদানশীন এবং শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট (SZHM Trust)-এর মাননীয় ম্যানেজিং ট্রাস্টি, আওলাদে রাসূল (দ.), রাহ্বারে আলম হযরত শাহসুফি আলহাজ্জ সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.) মওলা হুযুর প্রদত্ত অভিভাষণ ও আশিস বাণী বর্তমান সময়ের মানুষের জন্য মূল্যবান দিক-নির্দেশনা। এতে রয়েছে বিশ্বের সব মানুষ ও দরবারের সকল ভক্ত-অনুরাগীদের জন্য জীবন দর্শন ও অনুপ্রেরণা। বিভিন্ন পবিত্র আয়োজন, উরস শরিফ ও সম্মেলন উপলক্ষে তাঁর দেয়া আশিস বাণী ও অভিভাষণের দশটি একত্রে গ্রন্থিত করে আলোকধারার এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো।

গাউসিয়া হক মনজিলের আয়োজনে মহান ১০ মাঘ গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) ১১৪তম উরস শরিফ উপলক্ষে ১৬ জানুয়ারি ২০২০, ১০ দিনব্যাপি কর্মসূচির অংশ হিসেবে শাহী ময়দান মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ, মাদরাসা-ই-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাখা ও প্রাক্তন ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তাজকেরা-ই-চেরাগে উম্মতে আহমদী মাহফিলে প্রদত্ত আওলাদে রাসূল (দ.), রাহ্বারে আলম হযরত শাহসুফি আলহাজ্জ সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.) মওলা হুযুর প্রদত্ত অভিভাষণ।

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.) কিবলা কাবার মহান ১১৪তম উরস মোবারক ১০ মাঘ। এই পবিত্র উরস মোবারককে সামনে রেখে হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) আউলাদের অধিকারে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) কর্তৃক প্রদত্ত অধিকারের দায়িত্ববোধে এই মহান উরস মোবারকের যে এস্তেজাম গাউসিয়া হক মনজিলের পক্ষ হতে হয়ে এসেছে তারই ধারাবাহিকতায় হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) মর্যাদার শান-আযমতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, গতানুগতিকভাবে নয়, আর দশটি উরস মোবারক যেভাবে আয়োজিত হয় সচরাচর সেভাবে নয়, হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাঁর

মর্যাদার উপযুক্ত এস্তেজাম তো সম্ভব নয়। কিন্তু তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাঁর সে মহান গৌরবময় মর্যাদাময় যে অবস্থান, তার সাথে কিছুটা যাতে মানুষ বুঝতে পারে, সে মতো করে চিনতে পারে, শিখতে পারে, উৎসাহিত হতে পারে, অনুপ্রাণিত হতে পারে, উজ্জীবিত হতে পারে নব প্রজন্ম, সেভাবে গাউসিয়া হক মনজিলের তরফ থেকে মহান ১০ মাঘকে (উপলক্ষ করে) ১০ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় আজকে গাউসিয়া হক মনজিলের উদ্যোগে মাদরাসা-ই-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পরিচালনায়, মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্রদের সহযোগিতায়, এলাকাবাসীর সহযোগিতায়, আউলাদে পাকগণের সহযোগিতায় আজকের এই তায়কেরা-ই-চেরাগে উম্মতে আহমদী মাহফিল।

এই মাহফিলে উপস্থিত উলামায়ে কেরাম, উপস্থিত আশেকানে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে এই বৃহস্পতিবার, জুমআর রাত, দরবারে পাকে জায়েরীনগণ আসছেন, আসবেন, মাহফিল হবে, নানান কর্মসূচি আছে আমরা সৎক্ষিপ্তভাবে এই মাহফিলের এস্তেজাম করেছি। তদুপরি ১০ মাঘের বৃহত্তম এস্তেজামের ভেতরে আমরা দরবার শরিফের শাহী ময়দানে, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) কদমে, আমরা এই মাহফিল গাউসিয়া হক মনজিলের তরফ থেকে আয়োজন করেছি। এই মাহফিলে যারা কষ্ট করেছেন, খেদমত করেছেন, শরিক সামিল হয়েছেন দূর-দূরান্ত থেকে, সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে এই শাহী ময়দানের যিনি তত্ত্বাবধায়ক-মোতোয়াল্লি, উনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি উনার সহযোগিতার জন্যে এবং সকল আউলাদে পাকগণকে

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) কিছু শান-আযমত বর্ণনা করে নিজেরা যাতে আমরা ধন্য হতে পারি, বরকত হাসিল করতে পারি, নিজেদের মুক্তির কিছু সম্বল আমরা অর্জন করতে পারি, তার জন্যে এই মাহফিল। আপনারা জানেন, হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) গদির উত্তরাধিকার একমাত্র সাজ্জাদানশীন অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত শাহসুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) কেবলা কাবা, উনার জীবদ্দশায় উনার বড় পুত্রকে গাউসিয়া হক মন্জিলে উনি প্রেরণ করেন এবং সেখানকার সমস্ত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন করেন। সেই থেকে গাউসিয়া আহমদিয়া মন্জিলেরই একটি সম্প্রসারিত অংশ হিসেবে গাউসিয়া হক মন্জিল হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) আদর্শ প্রচারে, খেদমতে নিবেদিত থেকেছে। (এবং) সে খেদমতে বিশ্বালি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) কেবলার দয়াকে সামনে রেখে, আশেকভক্তগণকে নিয়ে, হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) যে মহান নিয়ামত আমাদের জন্যে রেখে গেছেন, সে নিয়ামতকে আমাদের সামনে বিশ্বালি শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী (ক.) চিনিয়েছেন, বুঝিয়েছেন, অনুধাবন করিয়েছেন, উপলব্ধির মধ্যে এনে দিয়েছেন। বিশ্বালি শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারীর (ক.) খেদমতে নিবেদিত আশেকগণ, গোলামগণ তাঁর অনুপ্রেরণায় সেই উজ্জীবনী শক্তিকে উজ্জীবিত করে দিকে দিকে, দেশে দেশে, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) শান-আযমতকে, আদর্শকে সম্প্রসারিত করার জন্যে (সেই ঝাঙাকে তুলে ধরার জন্যে) দিকে দিকে, চেষ্টা করে চলেছেন। নানা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে খেদমত করে চলেছেন। যে যেখানে পেরেছেন মাহফিল প্রতিষ্ঠা করেছেন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেসবগুলোকে আমরা শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনার ভেতরে এনে আলহামদুলিল্লাহ্ একটি সুচারু ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আসতে আমাদের (প্রচেষ্টাকে) আল্লাহ্ রাক্বুল আলামিন কবুল করেছেন। হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) খেদমতে, ত্বরিকার খেদমতে গাউসিয়া হক মন্জিল এ পর্যন্ত যতো কর্মসূচি নিয়েছে সব অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) বরাবরে হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) শিক্ষা, দর্শন, ত্বরিকা, মর্যাদা, শান-আযমতের অনুকূলে। আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে যে, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতের তা'লিম দেওয়ার জন্যে আল্লাহ্ রাক্বুল আলামিন একজন গাউসুল আযমকে দায়িত্ব প্রদান করেন নি। যে কাজটি একটি মসজিদের ইমাম সাহেব সম্পন্ন করতে পারেন, একজন

সাধারণ আলেমকে দায়িত্ব দিলে সম্পন্ন করতে পারেন, একজন গাউসুল আযমের দায়িত্ব, কর্তব্য, কর্মপরিধি, অবদান এর চাইতে বহু বহু গুণে বিস্তৃত। হুজুর গাউসুল আযমের (ক.) আধ্যাত্মিক মর্যাদা যেমনি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত, সৃষ্টিব্যাপী বিস্তৃত, তাঁর অবদানও তেমনি ব্যাপক। শুধু কোন একটি চট্টগ্রাম অঞ্চল কিংবা বাংলাদেশ নয়, শুধু মুসলিম উম্মাহ্ নয়, সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্তে আল্লাহ্ রাক্বুল আলামিন একজন গাউসুল আযমকে দায়িত্ব প্রদান করেন। আমরা হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) অবদান, হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) প্রয়োজনীয়তা আমাদের জন্যে আমরা যখন বুঝার চেষ্টা করব, কেন আমরা হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) শুকরিয়া আদায় করবো, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো, কেন হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীকে (ক.) অব্যক্ত স্বীকৃতি প্রদানে দ্বিধাগ্রস্ত হবো না। এই (এটা) তখন সম্ভব হবে, যখন আমরা হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) যা কিছু দিয়ে গেছেন সেটি যদি আমরা অনুধাবন করতে পারি। আমাদের আলোচক বলেছেন যে, আসলেই এটি (আমরা) প্রথমে আমরা অনুধাবন করতে পারি না যে, আমরা যেহেতু হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) শান-আযমতের প্রতি দ্বিধাগ্রস্ত, সেখানে বাকীটুকু তো আমরা নিজেরা বিচারক হয়ে পদমর্যাদা বিচার করতে চাই। জাজ করতে চাই, বিচার করতে চাই, যেখানে বড় বড় হস্তিগণ দ্বিধাহীনচিত্তে মুক্তকন্ঠে সেই ঘোষণা দিয়ে গেছেন, সেখানে আমরা নতুন করে জাজমেন্ট দিতে চাই, বিচার করতে চাই, ফলে জিল্লতি আমাদের গলার হার হয়ে এসে পড়ে। হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) যে নিয়ামত আমাদেরকে দিয়েছেন, বেলায়তির যে প্রভাব, বেলায়তির যে ক্ষমতা, সেটি তো আছেই, সাথে সাথে (যে) আমাদের এই যে বিশ্ব আজকে যুদ্ধভারাক্রান্ত, সংঘর্ষে আক্রান্ত, আমরা শুধু দেশে দেশে নয়, অঞ্চলে অঞ্চলে নয়, মুসলমানে মুসলমানে শুধু নয়, এমনকি আমাদের নিজেদের ঘরে ঘরে আমরা দেখেছি, ত্বরিকত পন্থীদের ভেতরেও এক ত্বরিকতপন্থির সাথে আরেক ত্বরিকতপন্থির, এক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের একটি সংগঠনের সাথে আরেকটি সংগঠনের, একটি বৈরিতা, বৈপরীত্য। সাংঘর্ষিক একটি মনোভাবের ভেতর দিয়ে অদ্ভুত এক কঠিন পরিস্থিতি অতিক্রম করছি। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্যে আমাদের উত্তরণ প্রচেষ্টা সক্ষম হবে না, যদি না আমরা আমাদের নীতিমালাগুলোকে সঠিকভাবে নির্ধারণ করে নেই। আমরা ভুল নীতিমালা, ভুল মৌলিক নীতিমালা, (অন্যদিকে) যেটি আল্লাহ্, রাসূল আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন এবং এই যুগের প্রেক্ষিতে যে নীতিমালাগুলো

আমাদেরকে ধারণ করে আমাদের চলতে হবে, যার ভিত্তিতে আমাদের বাকি সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করতে হবে, সেটি যদি আমরা সঠিকভাবে বুঝতে না পারি, অনুধাবন করতে না পারি, তাহলে এই ধরনের নানান সাংঘর্ষিক এবং বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে আমাদের পথ চলতে হবে। হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) এই নীতি-আদর্শ, শিক্ষা, দর্শন, এটি খোলাফায়ে কেরাম অনুধাবন করেছিলেন। সে ভাবে তারা সেই আদর্শ, সেই নীতিকে সেই চেতনায়, দেশে দেশে দিকে দিকে প্রচার করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এটি যখন সাধারণের জন্যে এবং বিশ্ববাসীর জন্যে একটি লিখিত রূপ দেওয়ার প্রয়োজন, তখন উনি ঘোষণা করছেন, উনি সব সময় নিজেকে আড়াল রেখেছেন, আড়াল রেখে চলেছেন। হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিয়েছেন। কোন কোন সময় উনি কিন্তু নিজেকে প্রকাশও করেছেন, উনি দাবি করেছেন যখন প্রয়োজন হয়েছে। উনি দাবিও করেছেন যে, হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) উত্তরাধিকারী হিসেবে এটি আমার উপরে দায়িত্ব, এটি জানিয়ে দেওয়া পর্যন্ত। উনার নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী হিসেবে এটি উনি লিখে গিয়েছেন। দাবি করেছেন, এটি জানিয়ে দেওয়াটা আমার দায়িত্ব-কর্তব্য এবং এই কর্তব্যকর্ম আমি করছি। আমি যা লিখছি এগুলো সবই হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) আদর্শ এবং শিক্ষা, যেটিকে যদি আমরা কিছু পয়েন্টের ভেতরে নিয়ে আসি তাহলে দেখা যায় তার মধ্যে একটি হচ্ছে 'বেলায়তে মোতলাকা' অর্থাৎ যুগ পরিবর্তনের বিষয়টি আমাদেরকে বুঝতে হবে। শর্ত যে পরিবর্তিত হয়েছে, এটি যদি আমি অনুভূতিতে না আনি আমি যতই ফতোয়া দিই, যতই ফিকাহ শাস্ত্র রচনা করি সেগুলো কার্যকরী হবে না। সেগুলো বিভ্রান্তি সমাধানে কার্যকরী হবে না। বরঞ্চ নতুন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে। বেলায়তে মোতলাকার যুগ-পরিবর্তনকে আমাদের বুঝতে হবে; এবং এ যুগের আদলে মোতলাকের ভিত্তিতে যে আমাদের নীতিমালাকে তৈরি করতে হবে, তৌহিদে আদ্বীয়ানের ভিত্তিতে যে আমাদের নীতিমালাকে তৈরি করতে হবে, উসুলে সাব'আর ভিত্তিতে যে আমাদের ব্যক্তিগত দর্শন এবং সমাজদর্শনকে নির্মাণ করতে হবে, এটা বুঝতে হবে। এগুলো যদি আমরা অনুধাবন করতে না পারি তাহলে শরীয়ার যে উদ্দেশ্য যে মকাসেদে শরীয়াহু, শরীয়ার একটি উদ্দেশ্য আছে, মানুষের যে কল্যাণ শরিয়ত চাইছে সেটি আমরা দিতে সক্ষম হবো না এবং হচ্ছি না। আমরা মুখে দাবি করছি যে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং শান্তির ধর্ম। বিশ্বে এই ইসলামের নীতিমালা শান্তি আনয়ন করতে পারে কিন্তু মুসলিম

উম্মাহর এককিলোমিটার জায়গাও আপনি পাবেন না যেখানে আমরা মুসলিম উম্মাহু, আমরা মুসলমানেরা একটি আদর্শ, একটি অবস্থান আমরা তৈরি করে দেখাতে পেরেছি- যে এটিই হচ্ছে সেই ইসলামের সেই মডেল, যেটি আল্লাহু রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দিয়েছেন। পিয়ারা নবী আমাদেরকে গাইড করেছেন, এটি হচ্ছে সেই মডেল, কিন্তু আমরা নিজেরা সেটি করে দেখাতে পারছি না। কারণ হচ্ছে নীতিমালা নির্ধারণ করতেই আমরা ভুল করে ফেলছি। আমাদের মূল সংবিধান তো আছেই, কিন্তু সেই সংবিধানের আলোকে যখন আমরা পেনালকোড করছি তাতে আমরা নানা ধরনের নীতিমালা করছি। তারপর আমরা যে শর্তগুলো, যুগের সে শর্তগুলো যেহেতু অনুধাবন করতে পারছি না, সেজন্য আমরা বার বার হোঁচট খাচ্ছি। শুধু বাংলাদেশে নয়, চট্টগ্রামে নয়, সারা বিশ্বব্যাপী এই জন্য হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) আমাদের সেই দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন বেলায়তে মোতলাকাতে, যেটি অছিয়ে গাউসুল আযম বিন্যস্ত করেছেন। কারণ আমরা মনে করি আকিমুস সালাত মানে হচ্ছে নামায পড়ার নাম। কিন্তু অছিয়ে গাউসুল আযম বেলায়তে মোতলাকাতে বলেছেন, এটি হচ্ছে একটি তাঁবু, একটি তাঁবু ভাঁজ করা, সেটিকে তুলে মানুষের ব্যবহারের উপযোগি করার যে একটি প্রক্রিয়া, এই পুরো প্রক্রিয়াটি, অর্থাৎ নামায শুধু পড়লে হবে না, এর Pre-Requires, যে Precondition গুলো আছে সেগুলো যদি আমরা উপযুক্তভাবে Qualify করতে না পারি, তাহলে আমরা সালাতকে কয়েম করতে পারছি না, আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। সে জন্যই আমরা দেখি যে, আমি এই মডেলটা আগেও বলেছি, আমি নিজের ক্ষেত্রে খুব উৎসাহিতবোধ করি, কারণ আমি তাদের মতামত চিন্তা করব না, তারা চেষ্টা করেছেন। সৌদি আরব, তারা যত পয়সা খরচ করে যত সময় নিয়ে যতভাবে পেরেছে, সেটি তাদের নিজস্ব মত প্রচারের জন্যে করেছে। সেটিকে ইসলাম প্রচারের জন্যে তারা করেছে বলে আমরা মনে করি না। তারা মতবাদ প্রচারের জন্যে করলেও তাদের ইসলামের নামে তারা যে তাদের মতবাদ প্রচার করেছে, তার জন্যে যত চেষ্টা করেছে, তাদের নিজস্ব ভূখণ্ডে আমরা আজ কী দেখতে পাচ্ছি না যে, তারা আসলে নীতিগতভাবে ব্যর্থ হয়েছে। খোলস সব ঠিক আছে, কিন্তু ভেতরে তারা ঝাঁজরা হয়ে গেছে, খোপরা হয়ে গেছে। ইসলামের যে মূল আলো, মূল যে শিক্ষা, সেটি তারা তাদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রভাবিত করতে পারে নি। তাদের সমাজকে তারা মডেল ইসলামি সমাজে পরিণত করতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তারা সঠিক নীতিমালা অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, অন্যভাবে বলতে গেলে আমরা সারা উম্মাহু এই

সংবাদটি জানি যে আমরা সাফার করছি। এজন্যই হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) নীতিমালাসমূহ আমাদের অনুধাবন করা প্রয়োজন, বিশেষ করে যারা উলামায়ে কিরাম আছেন মাদরাসা এ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.), তাদেরকে অনুরোধ করব, তারা যাতে এগুলো তাহকীক করার চেষ্টা করেন, বুঝার চেষ্টা করেন। আমরা এভাবেও তো ধরে নিতে পারি যে, এটি একটি, আমরা যারা একাডেমিক্যালি দেখতে চাই, আমরা পরীক্ষা করি, আমরা পরীক্ষা করি না কেন। অন্য যে প্রপোজালগুলো আছে সেগুলোকেও পরীক্ষা করি, এটিকেও পরীক্ষা করে দেখি যে, কোন্ নীতিমালা অনুসরণে কল্যাণ লাভ সম্ভব, কল্যাণের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। সেটি আমরা একটু পরীক্ষা করে দেখি, তার জন্য একটু তাহকীক করে দেখি। এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমি। আমি বুঝছি না বলে এটি শরীয়ত সম্মত নয়, আমার চিন্তায় আসছে না বলে আমার ভাবনায় ধরছে না বলে আমার মগজে বোধের মধ্যে আসছে না বলে এটি শরীয়ত সম্মত নয়, এধরনের ঢালাও বক্তব্য না দিয়ে, রিজেক্ট না করে, নিজের কল্যাণের পথ রুদ্ধ না করে আমরা কেন একটু গবেষণা করে দেখি না। কেন একটু পড়াশুনা করে দেখি না, কেন একটু রিসার্চ করে দেখি না, কেন একটু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখি না। একটি হারমুনিয়াস, একটি সম্প্রীতিময়, একটি শান্তিপূর্ণ, একটি সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠী যদি প্রয়োজন হয়, তার জন্য আমাদের কী নীতিমালা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাই না কেন? আমরা বিশ্বাস করি হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) যে নীতিমালা ‘বেলায়তে মোত্লাকা’ পুস্তকে বিধৃত হয়েছে, সেই নীতিমালার আলোকেই মুসলিম উম্মাহ্ তার হারানো বন্ধনকে ফিরে পাবে। মানবজাতি এই যে বিধ্বস্ত, যে মানবতা যুদ্ধবিধ্বস্ত, যে মানবতা রাজনীতি বিধ্বস্ত, যে মানবতার ইসলাম হচ্ছে একটি Spiritual Religion, আমরা সেটিকে বানিয়েছি একটি Political Religion, যেন ইসলাম এসেছে শুধু পলিটিক্স করার জন্য। ইসলামে রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনা আছে। মানুষের জীবনচলার পথে রাজনৈতিক জীবন তো আছেই, প্রশাসনিক জীবন আছেই, কিন্তু ইসলাম তো তার চেয়ে বহু কিছু দিয়েছে। ইসলামে সমাজনীতি আছে, রাজনীতি আছে, অর্থনীতি আছে, কিন্তু ইসলামে আধ্যাত্মিক নীতিও আছে। ইসলামের মূল বস্তুই হচ্ছে আধ্যাত্মিক নীতি, এটিকে আমরা পিছনে ফেলে যাচ্ছি, রাজনীতিটাই যেহেতু পপুলার, ক্ষমতার দাপটের সুযোগ আছে তাই ইসলামের নীতিগুলোকে আমরা অনেক সময় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একজনের সাথে আরেকজনের সংঘর্ষ লাগিয়ে আরেকজনের ফায়দা হাসিলের একটি কায়দা হিসেবে যেন

গ্রহণ করে থাকি। একজনকে খারাপ বলে দিয়ে, তাকে খারাপ প্রমাণিত করে দিয়ে আবার সকলে মিলে খারাপকে সাফাই দিয়ে রাতকে দিন করে আমরা যেন ইসলামের নামে একটি রাজনৈতিক, একটি প্রফেশনালনীতি অনেক সময় নির্মাণ করে ফেলি, এসব কারণে রাজনীতির মধ্যে কলুষতা আছে। অনেক সময় রাজনীতিতে বিবেক বর্জন করে দেওয়া হয়। যাকে ইসলামি আক্ফিদায় পারা যাবে না। এজন্য ইসলামে যেমন রাজনৈতিক দিক-দর্শন আছে, তেমনই ইসলামে রাজনৈতিক নিয়মকানুন আছে। ইসলাম তার পবিত্রতা রক্ষার জন্যে রাজনীতির সাথে তার সুনির্দিষ্ট ‘লাইক অব ডিমারকেশন’ বজায় রাখে। আমরা সব ডিমারকেশন ভেঙ্গে ফেলেছি। ইসলাম যে একটি আধ্যাত্মিক ধর্ম এটি ভুলে আমরা ইসলামকে রাজনৈতিক ধর্ম বানিয়ে ফেলেছি। আর এই ধরনের পরিস্থিতিতে কী হতে পারে পরিণতি, যদি বিচার-বিবেচনাহীনভাবে এটি চলতে থাকে, তাহলে তার পরিণতি কী হতে পারে তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে ‘কারবালা’। আমাদের চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে আল্লাহর মহান আউলিয়া কিরামগণের আদর্শ আমাদের বুঝতে হবে। তাদের দিক-নির্দেশনাগুলো বুঝতে হবে এবং তার ভিত্তিতে আমাদের উম্মাহর চলার পথ নির্ধারণ করতে হবে। উলামায়ে কিরাম যারা ফকিহ আছেন, মুফতি আছেন তাঁদেরকেও সেই অনুযায়ী নিজেদের গবেষণাগুলোকে শাণিত করতে হবে। এই ‘যুগ পরিবর্তন’ বিষয়টিকে আমরা উপেক্ষা করে যাচ্ছি, এ প্রসঙ্গে আমি আলাপচারিতায় একজন আলেমকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে প্রতি শতকেই একজন মোজাদ্দেদ আসার কথা, আমরা এই শতকের ‘মোজাদ্দেদ’ কে তা তালাশ করছি না কেনো? কারণ এই শতকের যেহেতু উনি মোজাদ্দেদ তিনি আমাদের কল্যাণের সূত্রগুলো দিয়ে দিবেন। তা তালাশ না করে আমরা বিগত শতাব্দীসমূহের মোজাদ্দেদগণকে নিয়ে আছি। তাদের নীতিগুলোও অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়, কিন্তু সেটি তো এডিশনাল, আমাদের বর্তমান যুগের জন্য যুগ পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে যেহেতু প্রতি একশ বছরে একজন মোজাদ্দেদ আসবেন বলে ঘোষিত হয়েছে। যা সকলভাবে স্বীকৃত। আমরা সেই ফায়দাটা নেওয়ার জন্য উৎসাহিত না কেন? খুঁজতে উৎসাহিত না কেন? তিনি আমাকে সদুত্তর দিতে পারেন নি। আমি জানতে চেয়েছি যে, ডাক্তাররা প্রত্যেক বছর বসে বসে একটি মাহফিল করেন, তাদের মতো করে মিটিং করেন যে, এই বছর হার্টের কী কী ঔষধ আসল, আর কী কী রোগ নতুন করে মানুষের খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে পরিবর্তন ঘটাল, কী কী ঔষধ দিলে নতুন পরিবর্তনগুলোকে সমাধান করা যাবে? নতুন ঔষধ আসলে এটা কেমন- ভাল না মন্দ কী ধরনের ক্ষতিকর,

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাদের গুলো একটি কনভেনশন এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমরা আমাদের বাংলাদেশের কথা ছেড়ে দিলাম। আমি এই অনুষ্ঠানে একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম একজন প্রখ্যাত আলেমকে যে, আমরা সারা দুনিয়ার কথা জানি না, আমরা চট্টগ্রামে গত বিশ-ত্রিশ বছরে এক বছরের জন্য সেই ধরনের একটি সুন্নী সম্মেলন শুনেছি কিন্তু ফকিহ সম্মেলন শুনি না কেন? যেখানে মুফতিরা বসে আলাপ-আলোচনা করবেন, চিন্তাভাবনা করবেন, যুগের চাহিদাকে যুগের কী প্রয়োজন সেটিকে তারা নির্ধারণ করবেন, এই যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণার যে মনোভাব এটির পরিবেশ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের সূত্র দেওয়া হলেও, আমাদের নীতি দেওয়া হলেও, যে কারণে সেগুলো গ্রহণ করতে পারছি না, বুঝতে পারছি না, কারণ বুঝার জন্য সে মানসিকতাই তো আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আমরা শুধু বাতিল খুঁজতে ব্যস্ত, হকের তালাশের চাইতে বাতিলের তালাশে আমাদের আগ্রহ বেশি। প্রথমেই খুঁজে বের করতে চাই কে বাতিল হয়েছে, বিচার সব আমি করে ফেলবো, কারো জন্য কোন বিচার অবশিষ্ট রাখবো না। আমি বাতিলের খোঁজে আগ্রহী, হকের তালাশের চেয়ে। বাতিলের তালাশে আমাদের আগ্রহ বেশি এটি আমরা বুঝতে পারি না, হয়তো আমরা ক্ষুদ্র চিন্তা থেকে বুঝতে পারি না। এটি আমাকে চিন্তিত করে, যা হওয়ার কথা যেভাবে যেটি হওয়ার কথা সেটি হয়না কেন? বরঞ্চ যেটি কাম্য নয় সেটি কেন হয়? কারো সাথে কথা বললে বুঝ-ব্যবস্থার অভাব আপনি টের পাবেন না, সব কিছু সবাই বুঝেন কাজের কাজ কিছুই হয় না। আমার মনে হয় এটির কারণ হচ্ছে, আমার জাগয়া থেকে আমি বলতে পারি যে, হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) যে দিক-নির্দেশনা সেটিকে যদি আমরা অনুধাবন করতে পারি, আমাদের গবেষণার মধ্যে আনতে পারি, আমাদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে আনতে পারি, আমরা যদি সেটির প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারি, তাহলে আমরা বিশ্বাস করি ধীরে ধীরে এই দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতির উন্নতি হবে ইনশাআল্লাহ। তো আজকের এই মাহফিল থেকে আমরা এই আশা পোষণ করছি, আল্লাহ্ রাক্বুল আলামিনের দরবারে এই ফরিয়াদ করছি, হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) কদমে এই এস্তেজার করে সকলকে ধন্যবাদ জানাই, ধৈর্যসহকারে উপস্থিত থেকে এই মাহফিলকে সফল করার জন্য। হয়তো একটু অগোছালোভাবে হচ্ছে, কারণ এই ময়দানে মাহফিল করার অভিজ্ঞতা আমাদের কম। দীর্ঘ অনেক বছর আমরা মাহফিল করি নি। যেহেতু কয়েক বছর ধরে হচ্ছে হয়তো অনেকের একটু অসুবিধাও হতে পারে। আমি সকলকে সব কিছু ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ করব। আর সবাই

দোয়া করবেন গত ২৬শে আশ্বিন একটি ভিডিও চিত্র প্রকাশ করেছে ট্রাস্ট, ড্রোন ভিডিও, অর্থাৎ আসমান থেকে তারা একটি ড্রোন উড়িয়ে দরবার শরিফকে ধারণ করার চেষ্টা করেছে। উরস শরিফের চিত্রটি, সেখানে আমি দেখেছি যে, ২৬শে আশ্বিনের দিনই ভিডিওটি ধারণ করা হয়েছে। রাতের দৃশ্যটি দেখে আমার মনে একটু খারাপ লেগেছে, প্রত্যেকটি মাজার শরিফই আলোকসজ্জায় সজ্জিত কিন্তু গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) মাযার শরিফটি ২৬শে আশ্বিনের দিন আলোকসজ্জায় সজ্জিত ছিল না। এটি আমার মনকে দুঃখবোধে ভারাক্রান্ত করেছে। দোয়া করবেন যাতে হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) আউলাদের পক্ষ থেকে, অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) আউলাদের পক্ষ থেকে, বিশ্বালি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) কেবলা কাবার পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা, হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) পরিবার যাতে হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) রওজা শরিফকে ২৬শে আশ্বিনের দিন আরজু মোতাবেক সাজাতে পারে আল্লাহ্ রাক্বুল আলামিন সেই আরজুকে কবুল করেন। তো আল্লাহ্ রাক্বুল আলামিন আমাদের ১০ মাঘের প্রতিটি কর্মকাণ্ডকে কবুল করুন। ১০ দিনব্যাপী শুধু গাউসিয়া হক মনজিলের নয়, সমস্ত দরবার শরিফের সমস্ত তুরিকার প্রতিটি দরবারে নানান কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি কর্মসূচিকে আল্লাহ্ রাক্বুল আলামিন যেন কবুল করেন, যেখানে মানবতার খেদমতে, সমাজের খেদমতে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের খেদমতে, তুরিকতের খেদমতে, বাংলাদেশের খেদমতে যে কর্মসূচিগুলো পালিত হয়েছে। ১০ মাঘকে সামনে রেখে সকলে এই সমস্ত কর্মসূচি সফল করার জন্যে সময় দিয়েছেন, শ্রম দিয়েছেন, অর্থ দিয়েছেন, নিজেদের মেধা, বুদ্ধি চেতনাকে নিবেদন করেছেন, আল্লাহ্ রাক্বুল আলামিন সকলকে দুনিয়াবি-উখরাবি সর্বোত্তম কল্যাণ-বিনিময় দান করুন। তো আমি আজকের মাহফিলের সভাপতি হিসেবে সকলকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে আউলাদে পাকগণকে, এই ময়দানের যিনি মুতাওয়াল্লি উনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং আয়োজন যারা করেছেন তাদেরকেও। এলাকাবাসীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র পরিষদকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, সকল আউলাদে পাককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, বিশেষ করে আপনারা যারা দূর-দূরান্ত থেকে এসেছেন সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এই মাহফিল সমাপ্ত ঘোষণা করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুল্হ।

এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত যাকাত তহবিলের কার্যক্রম উপলক্ষে প্রকাশিত বাৎসরিক ঐশী বাণীতে প্রদত্ত আশিস বাণী

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে যে, 'সদকা (যাকাত) তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তদসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাহাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে মুসাফিরদের জন্য। ইহা আল্লাহর বিধান, আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' (সূরা তাওবা : ৬০)।

আল্লাহতা'লার উক্ত বিধানের আলোকে সম্পদের যাকাত সঠিকভাবে প্রদান করা ইসলামের মৌলিক মহান মানবিক দায়িত্বগুলির অন্যতম। শোষণ, বঞ্চনাজনিত দারিদ্র্য থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যাকাত মহান আল্লাহতা'লার পক্ষ থেকে একটি অনন্য নির্দেশনা। সমাজের হতদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির জন্য দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প আল্লাহ প্রদত্ত একটি দিক-নির্দেশনা। তাই যাকাত প্রদান করা কোন করুণা প্রদর্শন নয়। বরং তা সমাজের ধনী ব্যক্তিদের বাধ্যতামূলক একটি মানবিক ধর্মীয় দায়িত্বের অংশ। আবার যাকাত গ্রহণ কোন লজ্জার বা হীনমন্যতার বিষয় নয়, বরং আল্লাহ প্রদত্ত দরিদ্রের অধিকার। এ কারণে যাকাত আদায় কার্যক্রমে যেমন অনীহা থাকা অনুচিত তেমনি আল্লাহ-আল্লাহর রাসূলের নির্দেশনার আওতায় যারা যাকাত গ্রহীতা তাদেরও

যাকাত গ্রহণে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়।

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী (কঃ) ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত 'মূলধারা সমাজকল্যাণ সমিতি'র অন্তর্ভুক্ত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (যাকাত তহবিল) যাকাত প্রদান ও গ্রহণের একটি সুসমন্বিত দায়িত্বশীল বস্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে এবং কার্যকর দক্ষ যাকাত তহবিল পরিচালনা পর্ষদ স্বচ্ছ, সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত যাকাত বিতরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে।

এ কারণে আল্লাহ তাদেরকে উপযুক্ত কল্যাণ দান করুন। সাথে সাথে আমার পক্ষ থেকে তাদের জন্য অসংখ্য মোবারকবাদ। আমি আরও মোবারকবাদ জানাই, মাইজভাগুরী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ এর সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, কাতার, কুয়েত ও বাহরাইন শাখা সমূহের প্রবাসী আশেকবন্দকে এবং দেশের যাকাত প্রদানকারী সম্মানিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে, যাদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় যাকাত কমিটির কার্যক্রম ব্যাপকভাবে এগিয়ে চলছে। পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে এই বিশাল কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত যাকাত প্রদানকারী ও গ্রহীতা সকলের দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোচ্চ কল্যাণ কামনা করছি। সকলের অবদান মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হোক এ আবেদন রাখছি। আমিন! বেহুরমতে সাইয়েদিল মুরসালীন।

The Message of the Honorable Managing Trustee of SZHM Trust, Rahbar-E-Alam Hajrat Shahsufi Alhaji Syed Mohammad Hasan (M.) Published in the annual periodical 'The Oishi Bani 2018' on the occasion of Zakat Tahbil activities of SZHM Trust

It is stated in the Holy Quran that Sadaqah (Zakat) is meant for (a) the distress (b) the poor and the needy, (c) people involved in the collection of Zakat, (d) Person whose heart is attracted or charmed by the beauty of Islam (i.e, newly converted Muslim), (e) People who are indebted, (f) the travelers, (g) for freeing the slaves and (h) for the cause of Allah (SWT), (Sura Tauba: 60)

To pay Zakat rightly in the light of the above mentioned rule of Allah (SWT) is one of the basic and great human responsibilities of Islam. Zakat is a unique instruction from the Almighty Allah (SWT) to drive the poor people from the poverty caused by exploitation and deprivation towards the prestigious and dignified livelihood. The poverty alleviation project (Zakat Fund) is a direction of right path for the assetless and disadvantaged poor given by Allah. (SWT).

Therefore, to pay Zakat is not to show mercy, rather it is part of an obligatory human and religious duty of the rich and solvent People in the society. Again to accept Zakat is not a matter of shame or narrow-mindedness, rather it is a right of the poor given by Allah (SWT). Hence there should not be any unwillingness or disinterest to

participate in Zakat collection programme or activities. In the same way, the Zakat recipients who are entitled to receive Zakat as per the instruction of Allah (SWT) and the prophet (SAW) should not feel shy to receive Zakat.

I am very pleased to know the poverty alleviation project (Zakat Fund) affiliated with the 'Muldhara Samaj Kalyan Samity' administered under the control of the Shahanshah Hazrat Syed Ziaul Huq Maizbhandari (k) Trust has built up a well-co-ordinated and integrated responsible distribution system of Zakat payment and receipt (i.e. disbursement) and the effective as well as efficient Zakat Fund Management Committee has been providing important contribution through the distribution of Zakat in a transparent, rightful and planned way.

May Allah (SWT) bless them all with desired success and welfare. I give them my heartfelt thanks. I also like to thank the devotees/members of the branches of Maizbhandari Gausia Huq Committee in UAE, Oman, Qatar and Bahrain residing abroad and the respective persons and organizations at home for paying Zakat and thus providing sincere co-operation to lead the activities of Zakat Committee ahead in a comprehensive way.

To Almighty Allah (SWT) I pray for the highest welfare both in the world here and the Hereafter of both the Zakat prayer and the Zakat recipient involved in this gigantic task. I Pray to Almighty Allah (SWT) to grant, accept and approve this great contribution of all concerned. Ameen. Behurmat-e-Syedil Mursalin.

১৭ জানুয়ারি ২০২০, মহান মাঘ উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত 'প্রতিবার দুয়ার খুলে আকাশ ছোঁব' শীর্ষক ত্রয়োদশ শিশু-কিশোর সমাবেশের ম্যাগাজিনে প্রদত্ত আশিস বাণী

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া এবং মহানবী (দ.) সমীপে অজস্র দরুদ ও সালাম। মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর ১১৪তম উরস শরিফ উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবারও মাইজভাণ্ডারী একাডেমি'র উদ্যোগে (ত্রয়োদশ) শিশু-কিশোর সমাবেশ ১৭ জানুয়ারি ২০২০ শুক্রবার যথাযথ উৎসবমুখর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

'শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট' নিয়ন্ত্রণাধীন মাইজভাণ্ডারী একাডেমির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সুফি সম্মেলন, পেশাজীবীদের জন্য সুফিতান্ত্রিক মিলন মেলা, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মিলন, উলামা সমাবেশ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সুফিতান্ত্রিক সেমিনার, মাসিক রুহানী সংলাপ এবং 'বেলায়তে মোতলাকা' বিষয়ক কর্মশালার মতো তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানমালার পাশাপাশি শিশু-কিশোর সমাবেশের এ আয়োজন তাদের সুকুমারবৃত্তির সঠিক বিকাশে অশেষ প্রেরণা সঞ্চরকারী। জীবনের উষালগ্নে অসীম আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশু-কিশোরদেরকে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চায় অভ্যস্ত করাই হচ্ছে এ সমাবেশের মূল লক্ষ্য।

গ্লোবলাইজেশন এবং ডিজিটলাইজেশনের উৎকর্ষ ও বিকাশের বর্তমান সময়ে আমাদের বহুমুখি যোগাযোগ এবং জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র নিঃসন্দেহে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে। তবে এগুলোর অনেক কিছুই নৈতিকতার বিবেচনায় প্রশ্নাতীত নয়।

এ কারণে শিশু-কিশোরদের কোমল প্রাণে আমাদের ধর্মীয় এবং জাতীয় সংস্কৃতির অভিন্নরূপের মিলনধারা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস ও প্রাণোচ্ছল মন-মানসিকতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ ধরনের সমাবেশ সুদূর প্রসারী তাৎপর্য বহন করবে।

গত বছর মাইজভাণ্ডারী একাডেমি আয়োজিত শিশু-কিশোর সমাবেশ যুগপূর্তি উদযাপন করেছে। এ বছর আয়োজন করা হয়েছে ত্রয়োদশ শিশু-কিশোর সমাবেশ। এ লক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক মনন সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এ ছাড়া ট্রাফিক সচেতনতা, অগ্নিনির্বাপণ বিষয়ে সচেতনতা, স্কাউটিং, রেড ক্রিসেন্ট, বিজ্ঞান মেলা প্রভৃতি প্রদর্শনীর মতো শিক্ষণীয় এবং প্রাণরস সৃষ্টিকারী অনুষ্ঠানমালা নিঃসন্দেহে আয়োজকদের আন্তরিকতার প্রমাণ দিচ্ছে। একই সঙ্গে অংশগ্রহণকারী শিশু-কিশোরদের মনের গভীরে সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তর এবং অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী ঐশী প্রেমের মাইজভাণ্ডারী দর্শনের আলো প্রজ্বালনে, সুস্থ পথের, স্রষ্টা প্রেমের প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টিতে, এ রকমের সমাবেশ বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি শিশু-কিশোর সমাবেশের আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই, সমাবেশের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। সমাবেশে অংশগ্রহণকারী শিশু-কিশোর তরুণ সহ সমবেত সকলের জন্য বিন্দু চিন্তে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাই- তিনি আমাদের সকলের প্রতি অশেষ রহমত বর্ষণ করুন। আমিন।

১৭ জানুয়ারি ২০২০, নাসিরাবাদ সরকারি (বালক) উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মহান ১০ মাঘ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ শিশু-কিশোর সমাবেশের অনুষ্ঠানে পঠিত আশিস বাণী

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া এবং মহানবী (দ.) সমীপে অজস্র দরুদ ও সালাম।

আজ সবচেয়ে আনন্দের বিষয় ত্রয়োদশ শিশুকিশোর সমাবেশ উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই পবিত্র মাটিতে মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর ১১৪তম উরস শরিফ উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো এবছরও মাইজভাণ্ডারী একাডেমির এই উদ্যোগ উন্নত জাতি ও মানস

গঠনে একটি বড় ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি। সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মতো শিশু-কিশোররা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কর্ণধার। ফলে তারা যদি সুন্দর, পবিত্র মন, যথাযথ জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক চেতনা নিয়ে বেড়ে উঠে তাহলে ভবিষ্যৎ পৃথিবী হবে সব মানুষের জন্য নিরাপদ। এজন্য এই নবীন প্রজন্মের জন্য সবার আগে মহান আল্লাহর দয়া ও রহমত কামনা করি।

এই মুহূর্তে শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীন মাইজভাণ্ডারী একাডেমির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সুফি সম্মেলন,

পেশাজীবীদের জন্য সুফিতাত্ত্বিক মিলনমেলা, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মিলন, উলামা সমাবেশ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সুফিতাত্ত্বিক সেমিনার, মাসিক রুহানী সংলাপ এবং ‘বেলায়তে মোতলাকা’ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানমালার কথা উল্লেখ করা যায়। এসব আয়োজনের মূল লক্ষ্যই হলো তাসাওউফের জ্ঞানের আলোকে স্রষ্টাপ্রেমি মানব সমাজের বিকাশ। এসব প্রয়াসের প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ সূচনাপর্ব এই শিশু-কিশোর সমাবেশ। যা সামাজিক ও নৈতিক উৎকর্ষ অর্জনের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের সুকুমারবৃত্তির সঠিক বিকাশে কল্যাণকর ভূমিকা রাখছে। আশা করি, জীবনের উষালগ্নে অসীম আনন্দের মধ্য দিয়ে আমাদের শিশু-কিশোররা অনাবিল সংস্কৃতি চর্চায় অভ্যস্ত হবে, শিখতে পারবে স্রষ্টাপ্রেম ও সব মানুষের প্রতি প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের মানবিক রীতিনীতি। এই মহৎ প্রচেষ্টার আলোকে গত বছর আয়োজিত শিশু-কিশোর সমাবেশে যুগপূর্তি অনুষ্ঠানমালার কথা নিশ্চয়ই সবার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এ বছর আরো এক ধাপ এগিয়ে ত্রয়োদশ শিশু-কিশোর সমাবেশের অনুষ্ঠানমালা জ্ঞান ও প্রীতির আকাশকে আরো প্রসারিত করবে বলে আমি মনে করি।

জেনে খুবই খুশি হয়েছি যে, এবারও শিশু-কিশোরদের মধ্যে বৃদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান ও মননশীলতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এ সবে মধ্য অন্তর্ভুক্ত জনচলাচলে ট্রাফিক সচেতনতা, অগ্নিনির্বাপণ বিষয়ে সচেতনতা, স্কাউটিং, রেডক্রিসেন্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞান মেলা। এসব প্রদর্শনীর আয়োজনে আয়োজকদের আন্তরিকতার স্বাক্ষর প্রশংসনীয়, যা প্রাণরস, আনন্দ, উৎসাহ সঞ্চার করবে এই সব শিশু-কিশোরদের মধ্যে।

একই সাথে অংশগ্রহণকারী শিশু-কিশোরদের মনের গভীরে, সমাজ সংস্কৃতির রূপান্তর বিষয়ে মাইজভাণ্ডার শরিফের ধর্মীয় সহাবস্থানের বহুত্ববাদি চিন্তা চেতনা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টিতে এ রকম সমাবেশ বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি শিশু-কিশোর সমাবেশের আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই, সমাবেশের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। সমাবেশে অংশগ্রহণকারী শিশু-কিশোর তরুণসহ সমবেত সকলের জন্য বিন্দু চিন্তে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি। আল্লাহ আমাদের সকলের প্রতি অশেষ রহমত বর্ষণ করুন। আমিন।

১৮ জানুয়ারি ২০২০, মহান ১০ মাঘ উপলক্ষে জমিয়তুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত উলামা সমাবেশে প্রদত্ত আশিস বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বিশ্ববরণ্য সুফি ও অধ্যাত্মসাধক, বাংলার জমিনে প্রবর্তিত একমাত্র তুরিকা, বিশ্বসমাদৃত তুরিকা-ই মাইজভাণ্ডারীয়ার প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)’র ১১৪তম উরস শরিফ উপলক্ষে মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার উজ্জ্বল নক্ষত্র অধ্যাত্ম শরাফতের অন্যতম সাধক গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)’র প্রপৌত্র বিশ্বালি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)’র পবিত্র নামে প্রতিষ্ঠিত ‘শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট’ এর উদ্যোগে মাইজভাণ্ডারী একাডেমির ব্যবস্থাপনায় দেশের বিশিষ্ট আলেম-উলামাদের নিয়ে ‘উলামা সমাবেশ ২০২০’ আয়োজন করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশ সহ বহির্বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর বিশালতার স্বরূপ উন্মোচনে প্রয়োজন যুগপৎভাবে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান সাধনা, যা কেবলমাত্র প্রকৃত আলেমদের পক্ষেই সম্ভব। সাম্প্রতিক সময়ে বাস্তবতার আলোকে অত্যন্ত সময়োপযোগী এ উলামা সমাবেশে ‘আউলিয়ায়ে কেরামের আদর্শ বাস্তবায়নের

মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব’ শীর্ষক বিষয় নির্ধারণকে সাধুবাদ জানাই।

সমাবেশে ধর্মীয় আলোচকরা যেমন বিষয়ালোকে বক্তব্য প্রদান করবেন তেমনি গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রবর্তিত বিশ্বসমাদৃত মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার বিশালতা তুলে ধরে আলেম সমাজসহ সাধারণ মানুষের এগিয়ে চলার পথ উন্মোচন করে আল্লাহর পথে নিয়ে যাবেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত একটি আদর্শের নাম। এ আদর্শ বাস্তবায়নে মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার আলোকে সকল সূন্নি আলেমসহ সর্বস্তরের জনগণের সম্পৃক্ততা আরো বৃদ্ধিতে আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে আশা করি। মহান ১০ মাঘ উরস শরিফ উপলক্ষে ১০ দিন ব্যাপী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ২০২০ সালের উলামা সমাবেশ সমসাময়িক ঘটনাবলীর আলোকে অত্যন্ত যুগোপযোগী উদ্যোগ।

আমি আজকের উলামা সমাবেশের সফলতা কামনা করি, এ মহতি অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত অতিথি-উপস্থিতি সহ বিশ্ব মুসলিম এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাই।

২০ জানুয়ারি ২০২০, মহান ১০ মাঘ উপলক্ষে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের বঙ্গবন্ধু হলে আয়োজিত আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মিলনে প্রদত্ত আশিস বাণী

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট (SZHM Trust) এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠান 'মাইজভাণ্ডারী একাডেমি'র উদ্যোগে ২০ জানুয়ারি ২০২০ সোমবার "আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মিলন ২০২০" অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে জেনে আমি বিশেষভাবে আনন্দিত। বাংলাদেশে প্রবর্তিত একমাত্র তুরিকা, বিশ্বসমাদৃত 'মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকা'র প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর ১১৪তম উরস শরিফ উপলক্ষে 'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট'-এর দশদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার মধ্যে এটি একটি নিয়মিত বাৎসরিক আয়োজন।

এই পৃথিবী মহান আল্লাহতায়ালা মহা প্রজ্ঞাময় সৃষ্টি বৈচিত্র্যে ভরপুর। মহান আল্লাহর প্রজ্ঞার ভেতর থেকে যে মহাবিজ্ঞানের উদ্ভাস, তা চিন্তাশীল স্রষ্টাপ্রেমি মানুষদের প্রতিনিয়ত বিস্মিত ও আনন্দিত করে। ধর্ম, বর্ণ, নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য ও নানাবিধ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে মানুষ মানবিক শান্তিপূর্ণ বিশ্বের অনুসন্ধান করে। স্বভাবতঃই সব ধর্মের মানুষই স্রষ্টাকে ভালবাসেন। স্রষ্টাকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করে তাঁর প্রতি প্রণত হতে চান। এই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের মধ্যে দৃশ্য-অদৃশ্য নানা রকম ভেদরেখা থাকলেও মহান আল্লাহতায়ালা পক্ষ থেকে তাঁর সৃষ্টি জগতের প্রতি করুণাধারা সবদিক দিয়েই বহমান। এক আদমের সন্তান এবং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সব ধর্ম, বর্ণ ও বিশ্বাস নির্বিশেষে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালবাসা যে একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্বের জন্য খুবই জরুরি তা আমরা বিশ্বাস করি।

এবারে তাই বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমানবতার মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উপায় খোঁজার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মিলনের আলোচ্য বিষয়ে। 'স্ব স্ব ধর্মগ্রন্থে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে আচরণের বিধি-বিধান' শীর্ষক আলোচনার বিষয়টি সবদিক থেকেই তাৎপর্য বহন করে। কারণ সবধর্ম এবং সব বিশ্বাসের মানুষেরা মানবতার অনুসন্ধানই করে। আর ধর্মতো মহান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে মানুষের প্রীতিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার কথাই বলে।

বাংলাদেশে ইসলাম ধর্ম ছাড়াও সনাতন, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, প্রকৃতিপূজারী, লোকধর্ম সহ নানা ধর্মাবলম্বী মানুষ বসবাস করেন। তাঁদের মধ্যে ধর্মাচারের পার্থক্য আছে এবং ধর্মপালনে মানুষের স্বাধীনতাও আছে। এ বিষয়ে আরো বলা যায় সকল ধর্ম বিশ্বাসীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি বিদ্যমান আছে। আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আমাদের বাংলাদেশ ধর্মীয় সম্প্রীতি এবং সহাবস্থানের যে দৃষ্টান্ত পৃথিবীর বুকে স্থাপন করেছে, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মিলনের মাধ্যমে তা আরো সুগভীর প্রীতিময়তার রূপ নেবে। আমরা পরস্পরকে সবসময় জানব আন্তরিকভাবে সুখে-দুঃখে। পরস্পরের সহমর্মী হিসেবে আমরা মানবিক ধারণায় এগিয়ে যাব।

আমি মাইজভাণ্ডারী একাডেমি আয়োজিত এ সম্মিলনের সফলতা কামনা করি। আশাকরি, ভবিষ্যতে এ ধরনের সম্মিলনের আয়োজন আরো প্রসারিত হবে এবং সব ধর্মের মানুষকে মানবিক প্রীতিতে আন্দোলিত করবে। অসাম্প্রদায়িক মানবিক সমাজ বিনির্মাণে যা হয়ে উঠবে অনুপ্রেরণার উৎস। আমি উপস্থিত সকলের কল্যাণ কামনা করি।

২০ জানুয়ারি ২০২০, এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এস জেড এইচ এম ট্রাস্টের 'বৃত্তি তহবিল'-এর উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রদত্ত আশিস বাণী

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

"জ্ঞানের যে সাধনা মনের উদারতা ও চরিত্রের দৃঢ়তা আনে সেটাই সঠিক জ্ঞান", শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র এ বাণীকে বাস্তবে রূপদানকল্পে আধ্যাত্মিকতার চারণভূমি চট্টগ্রামের বিশ্ববরণ্য সুফি ও অধ্যাত্ম সাধক, বাংলাদেশে প্রবর্তিত একমাত্র তুরিকা, বিশ্বসমাদৃত 'তুরিকায় মাইজভাণ্ডারীয়া'র প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র ১১৪তম মহান ১০ মাঘ উরস শরিফ উপলক্ষে মাইজভাণ্ডার অধ্যাত্ম শরাফতের অন্যতম সাধক ও উজ্জ্বল নক্ষত্র, পার্থিব জ্ঞান ও অপার্থিব ধ্যানের অসাধারণ সমন্বয়ক বিশ্বালি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র পবিত্র নামে প্রতিষ্ঠিত এস. জেড. এইচ. এম ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় 'শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) বৃত্তি

তহবিল'র উদ্যোগে মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদেরকে বৃত্তির নগদ অর্থ প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, দুর্গম পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা থেকে শিক্ষার্থী নির্বাচন করে তাদের সঠিক মেধা বিকাশের এই প্রচেষ্টা বাস্তবায়নের কাজে সম্পূর্ণ সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। গ্লোবালাইজেশন ও ডিজিটলাইজেশনের যুগে এ বৃত্তি প্রদান কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বিশ্বালির (ক.) বাণী'র সার্থক রূপদানে পূর্ণাঙ্গ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। এ উদ্যোগ তাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

আমি এ বৃত্তিপ্রদান অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করি। এতে উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিসহ সংশ্লিষ্ট সবার এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় মহান স্রষ্টার নিকট উত্তম প্রতিদান প্রার্থনা করি।

দরবারে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর গাউসিয়া হক মনজিল-এর সম্মানিত সাজ্জাদানশীন এবং 'শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট'-এর মাননীয় ম্যানেজিং ট্রাস্টি আওলাদে রাসূল (দ.) ও আওলাদে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরতুলহাজ্জ শাহ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.) ও 'বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি ও আসন্ন ২২ চৈত্র উরস শরিফ' 'পবিত্র লাইলাতুল বরাত' ও পবিত্র 'রমযানুল মোবারক' শীর্ষক দিক-নির্দেশনামূলক বাণী প্রদান করেন

বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি ও
আসন্ন ২২ চৈত্র উরস শরিফ
২৬ মার্চ ২০২০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আস্‌সালামু আলাইকুম। মানবজাতি আজ এক মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন। মহামারীর ভয়াবহতা জাতি ধর্ম বর্ণ শ্রেণি নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানবসন্তানের জীবন, মাল এবং জীবিকার নিরাপত্তার সকল দুনিয়াবি উৎসকে নির্মূল করে দিতে উদ্যত। এই পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা পরম করুণাময় আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালায় আশ্রয় গ্রহণ ব্যতিরেকে সৃষ্টিকূল উপায়হীন। আসুন আমরা এ অবস্থা হতে পরিত্রাণের জন্য পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালায় শরণাপন্ন হই, আরো বেশি বেশি তওবা, ইস্তেগফার, ইবাদত, যিকিরে নিবেদিত হই।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশও আজ কোভিড-১৯ মহামারীর ছোবলে। এই ভয়ানক বিপদ থেকে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে আমাদের আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক উভয়দিকের প্রতিকারের উদ্যোগ নিতে হবে। এ লক্ষ্যে আমাদের-তওবা ইস্তেগফার, আল্লাহর ছানা, রাসূলের (দ.) প্রতি দরুদ, ইবাদত বন্দেগীতে ব্রতী হতে হবে ব্যক্তিগতভাবে। মাক্বাসিদুশ শারীয়াহ্ তথা শরীয়তের উদ্দেশ্য অনুযায়ী জানমাল রক্ষার অগ্রাধিকারের শর্ত পূরণে আমাদের সামাজিক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের নীতিমালা নির্ধারণ করতে হবে। নফসজনিত ঠুনকো আবেগ নয়, দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে ইসলামের মৌলিক দিক নির্দেশনাকে প্রয়োগ করতে হবে।

জনগণের নিরাপত্তায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ এবং নীতিমালা মেনে চলতে হবে।

নিজের, পরিবারের এবং সমাজের নিরাপত্তাবিধানে অগ্রণী হতে হবে। এমনকি অজ্ঞাতসারেও অপরের জানমালের জন্য ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড থেকে সতর্কতার সাথে বিরত থাকতে হবে এবং অপরকে সচেতন করতে হবে।

দরিদ্র এবং অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, পরিচিতজনের সহযোগিতায় সাধ্যমত এগিয়ে আসতে হবে। কোন রকমের উন্মাদনা কিংবা প্ররোচনায় সহযোগিতা, সমর্থন থেকে বিরত থাকতে হবে।

গৃহে অবস্থানকালীন সময় আত্মা, মেধা-মনন এবং শরীরের জন্য গঠনমূলক কাজে নিবেদিত হতে হবে। 'সবর' এর সাথে সকলে মিলে এই দুর্যোগের মোকাবেলা করতে হবে।

আপনারা জানেন ২২ চৈত্র সমাগত। গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত শাহ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারীর মহান বার্ষিক উরস মোবারক। আমরা এই মহান দিনের বরকতে এই মহাবিপদ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লায় শরণাপন্ন হচ্ছি।

কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্তের আলোকে জনস্বার্থে এই বছর এই মহান দিবসের সকল আনুষ্ঠানিকতা হতে আমি বিশ্বওলি শাহানশাহ হযরত শাহ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর পরিবার এবং গাউসিয়া হক মনজিলের পক্ষ থেকেও বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এই মহান উরস মুবারক উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় কোন সাংগঠনিক সমাগম, সমাবেশ কাফেলা থেকে বিরত থাকার জন্য সকলকে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। গাউসিয়া হক মনজিলে শুধুমাত্র পারিবারিকভাবে এই বছর এই উরস আয়োজিত হবে। সকল আশেক-ভক্তবৃন্দকে ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ অবস্থানে ইবাদত বন্দেগী, মিলাদ, দোয়া দরুদের মাধ্যমে এই দিনটি স্মরণের জন্য নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে।

ইতোমধ্যেই যদি উরস মুবারক উপলক্ষে কোন হাদিয়া এন্তেজাম সম্পন্ন হয়ে যায় তাহলে তা স্থানীয় দুর্যোগ প্রশমনের প্রয়োজনে ব্যয় করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে।

জাতি ধর্ম বর্ণ শ্রেণী, দেশ জাতি, প্রবাসী, দূরনিবাসী, আশেকভক্ত শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সকলকে আল্লাহ রাক্বুল আলামিন গাউসুল আযম হযরত শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর উসিলায় এই দুর্যোগ থেকে পরিবার পরিজনসহ রক্ষা করুন। আমিন। বেহরমতে সাইয়েদিল মুরসালীন।

পবিত্র 'লাইলাতুল বারাত'

৯ এপ্রিল ২০২০

দরবারে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর গাউসিয়া হক মনজিল-এর সম্মানিত সাজ্জাদানশীন এবং 'শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট'-এর মাননীয় ম্যানেজিং ট্রাস্টি আওলাদে রাসূল (দ.) ও আওলাদে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরতুলহাজ্জ শাহ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)'র "শুভেচ্ছাবাণী"

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই বৈশ্বিক এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পরিবার-পরিজন নিয়ে যথাসাধ্য নিরাপদে আছেন। মহান রাব্বুল আলামিনের অশেষ দয়ায় প্রতিবারের ন্যায় এবারও আমরা একটি অতীব মহিমাম্বিত রজনী অতিবাহিত করতে যাচ্ছি। যেটিকে পবিত্র কোরআনের ভাষায় 'লাইলাতুল মোবারাকা' তথা বরকতময় রজনী এবং হাদিসের ভাষায় 'লাইলাতুল নিসফি মিন শা'বান' তথা শা'বান মাসের মধ্য রজনী হিসেবে বিভূষিত করা হয়েছে। আর আমাদের কাছে অধিক পরিচিত 'শবে বরাত' নামে।

দেশে বিদেশে অবস্থানরত মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার ভক্ত-অনুরক্ত-আশেকান, মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ ও রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত আহমদ মোজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.)'র উম্মাহু তথা উম্মতে আহমদীসহ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতিকে জানাই এই মহিমাম্বিত রজনী তথা লাইলাতুল বরাতের শুভেচ্ছা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই মহিমাম্বিত রজনীতে বর্তমান পরিস্থিতি সামনে রেখে যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে আজকের এই মহিমাম্বিত রজনী উদযাপন করা তথা ইবাদত-বন্দেগীতে নিবেদিত হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন।

বর্তমান এই সংকট একদিন কেটে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমরা আবারও একদিন মাসজিদসমূহে, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ সহ সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার শরীফ সমূহ যিয়ারত, মুরব্বীগণের কবর যিয়ারত, আত্মীয় স্বজন, গরীব দুখীর খাবারের ব্যবস্থা, দরবারে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সাক্ষাৎ তথা বিস্তারিত সামাজিক আয়োজনে, ইবাদত বন্দেগীতে ক্ষমার উসিলা খুঁজে নিব ইনশাআল্লাহ।

হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী, অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী, বিশ্ব অলি শাহানশাহ বাবাজানের ফুযুযাতের বারাকাত এই নিদানের কালে আমাদের সম্বল হোক। মহান রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই মহান রজনীর উসিলায়

বৈশ্বিক চলমান পরিস্থিতিতে যাবতীয় বালা-মুসিবত থেকে পরিত্রাণ দান করত একটি সুন্দর, গঠনমূলক, কল্যাণময় জিন্দেগী দান করুন। আমিন।

পবিত্র 'রমজানুল মুবারক'

২২ এপ্রিল ২০২০

দরবারে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর গাউসিয়া হক মনজিল-এর সম্মানিত সাজ্জাদানশীন এবং 'শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট'-এর মাননীয় ম্যানেজিং ট্রাস্টি আওলাদে রাসূল (দ.) ও আওলাদে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরতুলহাজ্জ শাহ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)'র "শুভেচ্ছাবাণী"

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ! আমরা পবিত্র মাহে রমজানুল মুবারক বরণ করতে যাচ্ছি। যে মাসকে পবিত্র হাদিসে রাসূলুল্লাহ (দ.) তাঁর উম্মতের মাস বলে অভিহিত করেছেন। উম্মতে আহমদী (দ.)'র জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ মহিমাম্বিত এই মাস তথা রমজানুল মুবারকের সাথে আমাদের হায়াতে জিন্দেগী আরো একবার সম্পৃক্ত হতে যাচ্ছে বিধায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আলিশান দরবারে অগণিত শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি এবং দেশে বিদেশে অবস্থানরত তুরিকায় মাইজভাণ্ডারীয়ার অনুসারী আশেক, ভক্ত, অনুরক্ত, মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটির শাখাসমূহের সদস্যবৃন্দ সর্বোপরি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলকে জানাই মহিমাম্বিত রমজানুল মুবারকের শুভেচ্ছা।

আমরা এই পবিত্র মাসের যথাযথ মর্যাদা রক্ষা, অন্তর্নিহিত শিক্ষা অনুধাবন এবং নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুন্দর, সমৃদ্ধ এবং শান্তিপূর্ণ একটি সমাজ বিনির্মাণে রত থাকব।

সমগ্র বিশ্ব আজ মৃত্যু মিছিলে शामिल। ধনী গরীব, দেশ জাতি নির্বিশেষে জীবন জীবিকা, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা মানবজাতিকে হতবিস্বল করে রেখেছে। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এবং শ্রমজীবী মানুষ আতংকগ্রস্ত দিন অতিবাহিত করছে। পরিবার থেকে দূরে কিংবা প্রবাসে থাকা ব্যক্তিবর্গ উদ্বিগ্ন সময় পার করছেন। এক নজিরবিহীন বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে আমরা আজ উপনীত।

এই পরিস্থিতিতে আমি কোভিড-১৯ মহামারীতে ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিগণের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের প্রতি গভীর

সহানুভূতি এবং মহামারীর অভিঘাতে বিপর্যস্ত সকলের প্রতি আন্তরিক সহমর্মিতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা আমাদের সকলকে এই সুকঠিন সময় থেকে সংক্ষিপ্ততম সময়ের মাঝে উঠে আসার তাওফিক দান করুন। সকলকে এই মহামারীর আক্রমণ থেকে হেফাজত করুন। মহামারীজনিত সমস্ত ক্ষতি কাটিয়ে উঠার সক্ষমতা দান করুন। আসুন, সকল ধর্মশ্রেণীর মানুষ আমরা একে অপরের জন্য পরম করুণাময় মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। আমরা প্রাণ ভরে দোয়া করবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার প্রশাসনের জন্য যারা দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার, দেশের ভবিষ্যতকে নিরাপদ করার প্রত্যয় নিয়ে অবিশ্রান্তভাবে কাজ করে চলেছেন, তাদের জন্য যারা জীবনের মায়া, পরিবারের মায়া উপেক্ষা করে হাসপাতাল-চিকিৎসালয়গুলোতে রাতদিন সেবা দিয়ে চলেছেন- ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী ও সহকারীবৃন্দ। আমরা দোয়া করবো সকল আইনশৃংখলা বাহিনীর নিরাপত্তার জন্য যারা দেশব্যাপী মহামারী নিয়ন্ত্রণে, দুর্বৃত্ত দমনে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন এবং দোয়া করবো তাদের জন্য যারা তৃণমূল পর্যায়ে দৈনন্দিন নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা, যোগান দেয়ার কাজটি করে চলেছেন ঝুঁকি মাথায় নিয়ে।

আমরা দোয়া করবো তাদের হেদায়তের জন্য যারা এই দুঃসময়ে ত্রাণ চুরি করে অসহায় মানুষকে অনাহারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দোয়া করবো তাদের হেদায়তের জন্য যারা ক্ষতিগ্রস্তদের আপদকালীন সহায়ক ব্যবস্থা থেকে অন্যায়ভাবে সুবিধা গ্রহণের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। আমরা দোয়া করবো তাদের হেদায়তের জন্য যারা ধর্মের দোহাই দিয়ে ইসলামী নৈতিকতাকে উপেক্ষা করে সরকারি বিধি নিষেধ পরোয়া না করে বিপুলসংখ্যক লোক সমাগম ঘটিয়ে মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে জানের ঝুঁকিতে ঠেলে দিয়েও জাতির কাছে দুঃখ প্রকাশে অনিচ্ছুক। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই দুর্যোগকালীন সময়ে আমাদেরকে, মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি সহানুভূতিশীল, সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার যোগ্যতা দান করুন।

দেশ বিদেশের মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটির সকল শাখা ও ট্রাস্ট-এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের যে কোন দুর্যোগে সবসময়ই দুর্যোগকবলিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। এই মহামারীতেও ইতোমধ্যে তারা ব্যাপকভাবে দুর্গত জনসাধারণের কষ্ট লাঘবে বিপুল উদ্যমে এগিয়ে এসেছে। আমি তাদের এই খেদমতের জন্য ধন্যবাদ জানাই। পরম করুণাময় তাদের এই মেহনত কবুল করুন।

এই রমজানেও দুর্যোগক্লিষ্ট, অনাহারী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কর্মসূচি সাধ্যমত চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। কমিটির সদস্যবৃন্দের খবরাখবর সংগ্রহে উদ্যোগী হওয়া উচিত। বিপদগ্রস্তের সাহায্যে সম্ভব সবরকম সহায়তার হাত, এলাকাবাসীকে সাথে নিয়ে সম্মিলিতভাবে সহায়তার হাত বাড়ানো প্রয়োজন। শত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বিন্দু বিন্দু করে জমিয়ে সিঁদ্ধ পরিমাণ সহানুভূতি আমরা বিতরণ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

আমরা যেন পবিত্র রমযান মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদত তথা রোজা, তারাবিহর নামায, সাহরি, ইফতার, কুরআন তেলাওয়াত, তাসবিহ-তাহলিলসহ যাবতীয় কার্যক্রম সুস্থ শরীর এবং পবিত্র মন নিয়ে সম্পাদন করার মাধ্যমে এই মাসের যথাযথ সম্মান রক্ষা করে নিজে-নিজেদেরকে প্রকৃত মানুষের কাতারে शामिल করতে পারি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে এই ফরিযাদ এবং রমজানুল মুবারকের উসিলায় তিনি যেন বিশ্বব্যাপী এই মহাবিপদ থেকে সকলকে রক্ষা করেন। আমিন। সুম্মা আমিন। বেহরমতে সাযিয়াদিল মুরসালিন, ওয়া আলিহি ওয়াসহাবিহি ওয়া আউলিয়া-ই উম্মাতিহি আজমাঈন।

সুফি উদ্ধৃতি

- এক দেরহাম কুরযে-হাসানা (ধার) প্রদান করাকে হাজার দেরহাম ছদকা র চেয়ে অধিক পছন্দনীয় বলে মনে করি।
- সেই ব্যক্তি কখনো ইবাদতের স্বাদ পাবে না, যার অন্তরে আল্লাহুতা'য়ালাকে পাওয়ার জন্য আত্মহ এবং উৎসাহ জন্মে নি।
- যে ব্যক্তি তাঁর সন্তান-সন্ততিকে দ্বীন শিক্ষা দেয় এবং নেক পথে পরিচালিত করে, রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে নিজ সন্তানদের ঘুমের মধ্যে সতর অনাবৃত হলে তা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়, তবে তার এই আমল জিহাদের চেয়েও অধিক ফজিলতপূর্ণ।
- দুনিয়াদার লোক যার খুব বেশী কদর ও সম্মান করে, তার কর্তব্য নিজে-নিজে খুব অপদার্থ ও তুচ্ছ মনে করা। যার ফলে আত্মগরিমা হতে নিরাপদ থাকতে পারে।
- আল্লাহুতা'য়ালার সান্নিধ্য লাভ এবং মানুষ থেকে দূরে সরে থাকা অন্তরের চিকিৎসা।
- যে বস্ত্র প্রত্যেক প্রকারের ভয়কে অন্তর হতে দূর করে দেয় এবং উহার দ্বারা অন্তর শান্তি ও স্থিরতা লাভ করে তা যাহের এবং বাতেনের মুরাকাবা।

---হযরত আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ.)

বেলায়তে মোত্লাকা

খাদেমুল ফোকারা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (ক.)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যুগ বিবর্তন : শৃঙ্খলিত ও অর্গলমুক্ত বেলায়ত

বেলায়তে মোকাইয়াদা

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) এর ইহকালীন জীবনে যে সুপ্ত সুফি মতবাদ সুনতে মোস্তফারূপে প্রচলিত ছিলো, তাঁর ওফাতের পর তা সুফি মতাবলম্বী অলিয়ে কামেলদের ত্বরিকত পন্থায় প্রচলিত ছিলো। কিন্তু দৃশ্যমান শরিয়তে শিক্ষিত ওলামাগণের এবং ইসলামি আদেশ-নিষেধের (হুকুমত) প্রভাবে, সেই ত্বরিকতের পথ ‘মোকাইয়াদা’ বা শৃঙ্খলিত ছিলো। সুতরাং এটাকে বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদীর যুগ বলা হয়।

বেলায়তে মোত্লাকা যুগের সূচনা

কালক্রমে যুগের পরিবর্তন ও বড়পীর দস্তগীর (ক.) থেকে প্রায় ছয়শ’ বছরেরও বেশি দীর্ঘ সময়ের দূরত্বের কারণে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাথে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে পড়ার কারণে ‘বিশ্ব-ইসলামী-ইমারত’-এর কাঠামোতে পুনরায় ভঙ্গন ধরে। এতে করে সমাজের শরিয়তসম্মত ব্যবস্থা প্রাণহীন ও দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অক্টোবর বাংলায় (বাংলাদেশে) ইংরেজ হুকুমত বা শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মোহাম্মদী স্বীন-রবির দ্বিপ্রহরে মানবকুল আবারো বিভ্রান্তির ধাঁধায় পড়ে যায়। এতে তারা আল্লাহুতায়ালার তিরস্কারের যোগ্য হয়ে পড়ে। যেহেতু সামাজিক আচার-ধর্মে রাষ্ট্রীয় সাহায্যহারা মুসলিম সমাজব্যবস্থা দিন দিন গতিহীন অচল ও দুর্বোলের মুখোমুখি হতে থাকে, সেহেতু প্রয়োজন দেখা দেয় এই অবস্থা থেকে মুক্তির। এই প্রাণহীন দুর্বল শরিয়তি ব্যবস্থায়ুগে নৈতিক ধর্ম-প্রধান এক বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদী যুগের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেই বেলায়ত, বিধান-ধর্ম ও রীতি-নীতি বা রেওয়াজ থেকে খোদার ইচ্ছা শক্তিকে প্রাধান্য দেয়, সেই বেলায়তের অধিকারী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিই বেলায়তে মোকাইয়াদা যুগের খাতেম বা সমাপ্তকারী এবং বেলায়তে মোত্লাকা যুগের আরম্ভকারী, ধর্মসাম্য ‘তৌহিদে আদ্বীয়ান’-এর সমর্থক। তাই হযরত শায়খুল আকবর আল্লামা মুহিউদ্দীন ইবনে আরবি এই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিকে খাতেমুল অলদ বলে উল্লেখ করেছেন।

কোরআন পাকের সূরা ‘ওয়াদোহা’র চতুর্থ আয়াতে বর্ণিত আছে ‘তোমার শেষ প্রথম হতে উত্তম’^১। এটি দীর্ঘ বেলায়ত যুগের সুসংবাদ।

কুতুবে জামান হযরত মাওলানা শাহসুফি সফিউল্লাহ সাহেবের ইলহামি উক্তি, “মিয়া চিন? কী চিন! ছয়শ’ বছরের মধ্যে এ রকম অলিউল্লাহ পৃথিবীতে আসেন নি।” হযরত আকদাসের মরতবা (মর্যাদা) সম্বন্ধে এটাও একটি সুস্পষ্ট ঘোষণা বটে, এই উক্তি ‘খ্যাতনামা জনগণের মন্তব্য’ শিরোনামে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ রকমভাবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে কঙ্কি অবতার বা শেষ ত্রাণকর্তা ইত্যাদি সুসংবাদ আছে। সুতরাং, এই যুগকে বেলায়তে মোত্লাকা বা মুক্ত সুফিবাদের যুগ বলা যেতে পারে।

বেলায়তে মোত্লাকা

নবুয়ত হচ্ছে মহান আল্লাহুপাক প্রদত্ত দায়িত্বপূর্ণ মহিমাম্বিত পদবি’র নাম। এটি স্থান-কাল-পাত্র এবং পরিবেশে সীমাবদ্ধ। কিন্তু বেলায়ত হচ্ছে অসীম, ‘অলিউন’ আল্লাহুতায়ালার একটি নামও বটে। এই শব্দটির অর্থ অন্তরঙ্গ বন্ধু। সুতরাং খোদা যেমন নিত্য, খোদার গুণ গরিমাও নিত্য ও অবিনশ্বর। সে রকমভাবে বেলায়তও নিত্য ও অবিনশ্বর। প্রকৃতপক্ষে বেলায়তই হচ্ছে নবুয়তের প্রাণ।

পবিত্র কোরআন পাকে বলা হয়েছে, ‘আল্লাহুতায়াল্লা হচ্ছেন ঈমানদারদের মুরুবি’^২ ‘খোদাতায়াল্লা (মুমিনদের) প্রশংসিত বন্ধু’^৩ ইত্যাদি বর্ণনা পবিত্র কোরআন পাকে রয়েছে। অথচ কোরআন পাকে নবী বা রসূল বলে আল্লাহুতায়ালার কোন নাম উল্লেখ নেই; কিন্তু ‘অলিউন’ বলে উল্লেখ রয়েছে দেখা যায়।

হযরত শায়খুল আকবর আল্লামা মুহিউদ্দীন ইবনে আরবি বলেন : (ক) খাতেমুল আউলিয়া (যিনি), (সেই তিনি) রসূলে করিম (দ.) এর উত্তরাধিকারী অলি হন। যিনি মূল (খোদাতায়াল্লা) থেকে সবকিছু গ্রহণ করে থাকেন। তিনি বেলায়তের সমস্ত মোকাম (মর্যাদাপূর্ণ পবিত্র ঐশী গন্তব্য) এবং মর্যাদার নিরীক্ষণকারী হন। (তিনি পুরনো বাঁধাধরা নীতিযুক্ত শৃঙ্খলিত বেলায়ত-যুগের পরিণতিকারী বা সমাপ্তকারী)। তিনি রসূল

করিম (দ.) এর সমস্ত রূপের মধ্যে একটি সর্বোত্তম রূপ। রসূল করিম (দ.) (সত্যের প্রতি অনুগত অগণিত মানুষের) জমায়াতের ইমাম (অবিসংবাদিত নেতা) হন, এবং শাফায়াতের (মানুষের মুক্তির জন্য খোদাতায়ালায় কাছে সুপারিশ) দরজার উন্মোচনকারী হিসাবে আদম সন্তানের সর্দার (নেতা) হন। (এই নেতৃত্ব) সর্দারি এক বিশেষ অবস্থায় খোদার নামাবলীতে শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগামী দেখা যায়। যেহেতু ইস্মে 'রহমান' বালা-মুসিবতের সময় বদলা গ্রহণকারীর (খোদার) কাছে (শৃঙ্খলা রক্ষার্থে) সুপারিশ করবে না।^৪ একটি উদাহরণ: চোরের ধর্ম চুরি করা। এর ফল স্বরূপ ধরা পড়ে (চোরকে) বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। বিচারাদালত অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী আইনের ধারা মতে চোরের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। বিচারক নিজে কোনরূপ দয়া বা অনুকম্পা প্রদর্শন করতে পারেন না। যেহেতু চোর নিজকৃত অপরাধের মাত্রা দ্বারা নিজেই তার শাস্তির মাত্রা নিরূপণ করেছে। সুতরাং, একটু তলিয়ে দেখলে বুঝা যায়, এখানে চুরির কর্তা অর্থাৎ চোর বিচারাদালতে তার নিজ কর্ম ফলের নিয়ন্তা এবং বিচারাদালতের উপর প্রভাবশালী। বিচারক বিচার বেলায় তার দয়াগুণ কাজে লাগাতে পারেন না। উপরন্তু বিচার প্রার্থীর কাছে সুপারিশও করতে পারেন না। (খ) ফসুসুল হেকমে আরো বর্ণিত আছে: ইস্মে 'আল্লাহ' খোদার সমস্ত নামাবলীকে সামিল করে। এই নাম উপাস্য হিসাবে নিজের বিভিন্ন মজহাব বিকাশস্থলে বিকশিত হয় এবং আল্লাহ নিজের জাত ও মর্তবা (গুণ, সম্মান, মর্যাদা) হিসাবে সমস্ত নামাবলী থেকে অগ্রগণ্য।^৫ অতএব এই আল্লাহ শব্দ যেই নামে বিকাশ পায়, সেই নামও খোদার অন্যান্য নামাবলীর বিকাশস্থল সমূহ থেকে শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন। যেমন 'আল্লাহ' শব্দ আহমদুল্লাহ নামের মধ্যে ব্যক্ত হচ্ছে। (গ) ফসুসুল হেকমে আরো লিপিবদ্ধ আছে: নিশ্চিত শ্রেষ্ঠত্ব ঐ ব্যক্তির জন্য, যিনি বর্তমান, আগত ও বিগত সমস্ত দরজার অবস্থাকে বেষ্টনকারী বলে সাব্যস্ত হন এবং কামালিয়াতের সমস্ত সফত (গুণ, মাহাত্ম্য) বা গুণের অধিকারী হন। যদিও তার ঐ সফত ও গুণাবলী প্রচলিতভাবে মানববুদ্ধির কাছে এবং শরিয়তের নিয়ম হিসাবে ভাল বা মন্দ বলে প্রতিপন্ন হয়। এই কামালে মোহিত বা সর্বব্যাপ্ত কামালিয়াত নিশ্চিতভাবে 'আল্লাহ' শব্দবিশিষ্ট অলিউল্লাহর জন্য সাব্যস্ত (নির্ধারিত, স্থিরীকৃত)।^৬ (ঘ) ফসুসুল হেকম-এর ৯১ পৃষ্ঠায় আছে : খাতেমুল আউলিয়ার দৃষ্টিকোণের পার্থক্য : আশিয়া ও রসূলগণ যা কিছু দেখেন, তা খাতেমুর রসূলের [হযরত মোহাম্মদ (দ.) এর] দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখেন এবং যা কিছু কোন অলিউল্লাহ দেখেন,

তা খাতেমুল আউলিয়ার আলো বা দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখেন। এমন কি পয়গম্বরগণও (রসূল) খাতেমুল আউলিয়ার আলো বা দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখে থাকেন। কারণ নবুয়তে তশরিয়ি বা বিধানগত ধর্ম ও কোন নবীর রেসালত (আল্লাহ প্রেরিত মহাপুরুষের প্রতিনিধিত্ব) নূতন ধর্মের নতুন নবীর আবির্ভাবে এক সময় রহিত হয়ে যায়। কিন্তু বেলায়ত কোন সময় রহিত হতে পারে না, বন্ধও হয় না। যেহেতু (কারণ) বেলায়ত, যা মহান আল্লাহতায়ালায় সঙ্গে অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত।^৭

আল্লামা মুহিউদ্দিন ইবনে আরবি (ক.)-এর 'ফসুসুল হেকম' গ্রন্থের ৯২ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা আছে: খাতেমুল বেলায়ত বা খাতেমুল আউলিয়া ইসলামরূপী দেয়ালের (কাঠামোর) শেষ গাঁথুনি বা শেষ ইট, নবুয়ত হচ্ছে ইসলামরূপী দেয়ালের প্রথম গাঁথুনি বা (প্রথম স্থাপিত) ইট। যেহেতু নবুয়ত আহকামী (আহকাম: আদেশ-নির্দেশাবলী) আদেশ-নিষেধমূলক, হযরত জিব্রাইল (আ.)-এর মধ্যস্থতায় প্রাপ্ত অহি (আল্লাহর বাণী)। এটা খনি থেকে প্রাপ্ত চাঁদির (খাদহীন রৌপ্য) ইটের সাথে তুল্য (তুলনীয়)। কিন্তু বেলায়ত খাতেমুল আউলিয়া কর্তৃক নিজ হাতে ঐ খনি থেকে প্রাপ্ত শক্তি; যেই খনি থেকে হযরত জিব্রাইল (আ.) অহি আনতেন, তাই এটা সোনালী (স্বর্ণমণ্ডিত) ইটের সাথে তুল্য। এই অহি ও এলহাম বিশিষ্ট নবুয়ত ও বেলায়ত ইট দ্বারা ইসলামী ইমারত নামক ঘরের নির্মাণ পরিসমাপ্ত (সম্পন্ন)।^৮

সারানুবাদ: ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ

মূল গ্রন্থের তথ্যসূত্র:

১. আল কোরআন সূরা ওয়াদোহা, আয়াত : ৪
২. আল কোরআন সূরা আল ইমরান, আয়াত ৬৮
৩. আল কোরআন, সূরা শুরা, আয়াত ২৮
৪. ফসুসুল হেকম (তরজমা), আল্লামা মুহিউদ্দিন ইবনে আরবি, ভাষা: উর্দু, মোস্তাফায়ী প্রেস লক্ষ্ণৌ, পৃ. ৯৩
৫. ফসুসুল হেকম, পৃ. ৯৩
৬. ফসুসুল হেকম পৃ. ৯৩
৭. ফসুসুল হেকম, পৃ. ৯১
৮. ফসুসুল হেকম, পৃ. ৯২

সহায়ক গ্রন্থ:

১. ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী অনূদিত 'BELAYET-E-MUTLAKA'(The Unchained Devine Relations or Unhindered Spiritual Love of God), ইংরেজী দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৭।
২. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, সংকলন ও সম্পাদনা : মোহাম্মদ হারুন রশিদ, প্রথম প্রকাশ : জৈষ্ঠ্য ১৪২২/ মে ২০১৫, বাংলা একাডেমি ঢাকা, বাংলাদেশ।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর তাসাওউফ

● অধ্যাপক জহুর উল আলম ●

মানব জীবনে অনুসৃত সচ্চরিত্র, সদগুণাবলী এবং সদাচারের নাম তাসাওউফ। আল্লাহর প্রতি মানুষের অন্তরের পরম ভক্তিপূর্ণ প্রেমানুগত্য, আল্লাহর প্রতি মানুষের গভীর ও নিরাবসর আরাধনা, পার্থিব মোহ লোভ-লালসা বর্জন এবং ঐশী নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করার নাম তাসাওউফ। তাসাওউফ সম্পর্কিত এ ধারণা অনুযায়ী সমগ্র মখরুকাতের দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র ‘ইনসানে কামিল’ মহানবী (দ.) হলেন তাসাওউফের মৌলিক উৎস। ব্যবহারিক অর্থে হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর পার্থিব জীবনটা ছিল তাসাওউফের পরিপূর্ণ আলো। মহানবী (দ.) এর ব্যক্তি, সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক জীবন প্রবাহে অনুশীলিত নীতি, নৈতিকতা, সততা, কর্মপ্রক্রিয়া ছিল আক্ষরিক অর্থে তাসাওউফ। তাঁর পারিবারিক জীবন, সামাজিক রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক এমনকি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জিহাদ সহ সার্বিক ব্যাপ্তিক জীবন চিত্রে পরিপূর্ণ তাসাওউফের প্রতিফলন ঘটেছে। এ জন্যে তিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতে অদ্বিতীয়, অতুলনীয় এবং সকলের জন্য অনুকরণীয় সর্বোত্তম আদর্শ। মহানবী (দ.) পৃথিবীতে আগমন মূহর্ত থেকেই আল্লাহর সার্বিক আশ্রয়ে লালিত পালিত হয়ে বেড়ে ওঠেছেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা, “তিনি (আল্লাহর) কি আপনাকে এতিম অবস্থায় পান নি এবং তারপর আপনাকে আশ্রয় দান করেন নি? পথহারা অবস্থা থেকে তিনি কি আপনাকে সত্যপথের সন্ধান দেন নি? (সূরা দোহা: ৯৩:৬-৮)। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে মহানবী (দ.) তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহকে (রা.) হারান। অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ (রা.) ইত্তিকাল করেন। এক গায়েবী আওয়াজে নির্দেশিত হয়ে ভূমিষ্ঠ হবার পর তিন দিন শিশু হযরত মুহাম্মদ (দ.)কে কাকেও দেখানো হয় নি। এমন কি দাদা আবদুল মোত্তালিবকেও না। মহানবী (দ.) মাত্র ছয় বৎসর বয়সে মদীনা হতে মক্কা ফেরার পথে ‘আবওয়া’ নামক স্থানে মাতা হযরত আমিনা (রা.) ইত্তিকাল করেন। তখন এ ধরনের করুণ শোকাবহ মূহর্তে সঙ্গে ছিলেন সেবিকা হযরত উম্মে আয়মান বারাকাহ বিনতে ছালাবা (রা.) এবং শিশুপুত্র হযরত মুহাম্মদ (দ.)। গভীর অন্ধকারে তাঁদের নিকটে কোন মানুষ ছিল না। রাতে প্রবল বাতাস বইছিল। বাতাসে চারিদিকে ধূলিঝড় উঠেছে। হযরত আমিনার (রা.) নিস্পাণ নিখর দেহ ঘিরে

বারাকাহ এবং শিশু মুহাম্মদ (দ.) এর অব্যোম কান্না চলছিল। এক পর্যায়ে বারাকাহ নিজ হাতে বালি সরিয়ে কবর করে তাতে দাফন করলেন হযরত আমিনাকে (রা.)। মূহর্তে ধূলিঝড়ে কবরের গর্তটি ভরে যায়। দীর্ঘক্ষণ কবরের পাশে বসে দু’জন অশ্রু বিসর্জন করে অবশেষে বারাকাহ (রা.) মহানবী (দ.)কে নিয়ে মক্কা ফিরে আসেন। মক্কা থেকে মদীনার দূরত্ব দু’শ মাইল। একজন রমণী ও এক শিশুর এতো দীর্ঘ পথ অতিক্রমে দিবা-রাত্রিতে অন্যকোন সহযাত্রী বা সঙ্গী সাথী ছিল না। দুর্গম পথে একমাত্র বাহন একটি উঠ এবং দু’জন আরোহী- কি অসহায় অবস্থা, এর মধ্যে অবর্ণনীয় শোক বেদনা সবমিলে বুকে যেন বিশাল পাথরের বোঝা, এ ধরনের পরিস্থিতিতে মহানবী (দ.) ছিলেন একমাত্র আল্লাহর আশ্রয়ে। মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের রীতি অনুযায়ী নবজাতকের দুধপান ও সেবা যত্নের দায়িত্ব দেয়া হয় সাধারণত দুগ্ধ-গরীব মহিলাদেরকে। বিনিময়ে এ সকল মহিলারা অর্থ এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হন। মহানবী (দ.) ছিলেন পিতৃহীন। মা আমিনাও (রা.) অনেকাংশে অসহায়। রীতি অনুযায়ী দুধ সেবার জন্য মক্কার অন্যান্য শিশুদের মতো মহানবী (দ.)কে সমাবেশে হাজির করা হয়। অনেক সেবক-সেবিকা পিতৃ পরিচিতি এবং আর্থিক অবস্থান জেনে নিয়ে অবজ্ঞা করে মহানবী (দ.)কে লালনের দায়িত্ব নিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এ দিনের সমাবেশে প্রায় সকল শিশুকে দুধ পান করানো এবং সেবায়ত্নের দায়িত্ব নিয়ে অনেক সেবক-সেবিকা স্থান ত্যাগ করেন। তখন শুধুমাত্র অবশিষ্ট থাকেন শিশু হযরত মুহাম্মদ (দ.) ও একজন সেবিকা হালিমা (রা.)। তিনি কোন শিশু না পেয়ে অবশেষে মহানবী (দ.)কে লালন ও সেবা যত্নের দায়িত্ব নেন। এক অভাবনীয় ঘটনা তখন সকলের নজর কাড়ে। হালিমার (রা.) উট ছিল অত্যন্ত দুর্বল। পথ অতিক্রমে অনেকাংশে অক্ষম। দেখা গেল হযরত মুহাম্মদ (দ.) আরোহী হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য উষ্ট্রারোহীকে দ্রুত অতিক্রম করে ক্ষিপ্র গতিতে হালিমার (রা.) গৃহ অভিমুখে সবার পূর্বে মহানবী (দ.)কে পৌঁছে দেয় সেবা যত্ন প্রাপ্তির ঠিকানা। আর হালিমার (রা.) ছাগীগুলো দুধ দিত না। মরুভূমির উষ্ণ আবহাওয়া এবং খাদ্য সংকটের কারণে ছাগীর দুধ শুকিয়ে যায়। মহানবী (দ.) হালিমার (রা.) গৃহে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিক ভাবে ছাগী গুলো এতো বেশী দুধ দিতে শুরু করে যে হালিমার (রা.) স্বামী

সন্তানরা হতবাক হয়ে যায়। এ জন্যেই তো আল্লাহ্পাক বলেছেন, “তিনি কি আপনাকে আশ্রয় দেন নি।”

প্রথম বক্ষ প্রসারণের ঘটনা

মহানবী (দ.) তখন মাত্র চার বৎসরের শিশু। তিনি তখন সেবিকা হালিমার (রা.) গৃহে লালিত-পালিত হচ্ছেন। বকরী দেখার সময় হালিমার (রা.) ছেলেদের সঙ্গে তাঁকেও সঙ্গে করে মাঠে ময়দানে নেয়া হতো। একদিনের ঘটনা। সবাই খেলছে। হঠাৎ লক্ষ্য করলো তাদের ‘মদীনা ভাই’ নেই। এদিক ওদিক তাকানোর পর দেখা গেল ধবধবে শ্বেত-শুভ্র বসনধারী কিছু লোক তাঁকে ঘিরে শুইয়ে রেখে কি যেন করছে। কাছে গিয়ে দেখা গেল তাদের মদীনা ভাইয়ের বুক ফেঁড়ে উনারা কি যেন ঢুকিয়ে সেলাই করে দিয়ে তাৎক্ষণিক উধাও হয়ে গেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় সকলে বিমূঢ়। ‘মদীনা ভাই’কে সঙ্গে নিয়ে সকলে হালিমার (রা.) গৃহে প্রত্যাবর্তন করে ঘটনা খুলে বললে হালিমা (রা.) ভড়কে যান এবং দ্রুত মহানবী (দ.)কে স্বীয় মাতা হযরত আমেনা সমীপে সমর্পণ করার জন্যে মক্কা গমনের সিদ্ধান্ত নেন। মক্কা যাবার পথে হালিমা মহানবী (দ.) কে নিয়ে এক ইহুদী অতীন্দ্রিয়বাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। ইহুদী অতীন্দ্রিয়বাদী সমস্ত ঘটনাশুনে পর্যবেক্ষণ করে লক্ষ্য করেন যে উনি তো তাওরাতে উল্লেখিত সর্বশেষ পয়গম্বর। চীৎকার দিয়ে অতীন্দ্রিয়বাদী সবাইকে লক্ষ্য করে বলে উঠেন ‘কে আছ এক্ষুণি এ শিশুকে নিঃশেষ করে দাও। নতুবা ভবিষ্যতে এ শিশু বড় হয়ে তোমাদের আচারিত ধর্ম শেষ করে দিয়ে নতুন ধর্ম প্রচার করবে।’ অতীন্দ্রিয়বাদী ইহুদী হালিমার (রা.) কোল থেকে মহানবী (দ.) কে কেড়ে নিতে চাইলে হালিমা (রা.) দ্রুত উক্ত স্থান ত্যাগ করে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে মা আমেনার (রা.) নিকট মহানবী (দ.) কে হস্তান্তর করেন। ইহুদী অতীন্দ্রিয়বাদী সহ অন্যান্য ইহুদীদের কবল থেকে হালিমার (রা.) মতো একজন নারী মহানবী (দ.) কে নিয়ে দ্রুত সরে পরা- এটি আল্লাহর প্রত্যক্ষ আশ্রয় প্রাপ্তির কারণে সম্ভব হয়েছে।

মহানবী (দ.) দাদা হযরত আবদুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে থাকার সময় একদিন তাঁর প্রিয়তম নাতিকের হারানো উট খুঁজতে প্রেরণ করেন। উট খুঁজে আনতে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। এ দিকে দাদা হযরত আবদুল মুত্তালিব অস্থির হয়ে এক পর্যায়ে কাবা শরীফের দরজায় হাজির হয়ে কাবা গৃহের মালিক সমীপে অতি করুণ কণ্ঠে ফরিয়াদ পেশ করে বলেন, “হে আল্লাহ, আমার সওয়ার মুহাম্মদকে ফিরিয়ে দিন এবং আমার প্রতি সর্বোত্তম অনুগ্রহ

করুন।” উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, আবদুল মুত্তালিব স্বীয় নাতিকের যে কাজেই প্রেরণ করতেন তিনি তাতে সফল হতেন। আবদুল মুত্তালিব লক্ষ্য করলেন কিছুক্ষণের মধ্যে মহানবী (দ.) পিছনে উট সহ ফিরে আসছেন। এ ঘটনার পর হযরত আবদুল মুত্তালিব আর কখনো মহানবী (দ.)কে নিজ নৈকট্য থেকে মুহূর্তের জন্যেও দূরে যেতে দেন নি। উল্লেখ্য যে মহানবী (দ.) শৈশব থেকে যেখানে যেতেন সেখানে অদৃশ্য প্রহরী থাকত।

মাতৃ বিয়োগের পর মহানবী (দ.) এর দায়িত্ব নেন দাদা হযরত আবদুল মুত্তালিব। মাত্র দু’বছর অর্থাৎ মহানবী (দ.) আট বছর বয়স পর্যন্ত দাদার পরম স্নেহে এবং অতুলনীয় আদর সোহাগে লালিত-পালিত হলেও হযরত আবদুল মুত্তালিবের ইত্তিকালের পর তাঁর দায়িত্ব বর্তায় আপন চাচা হযরত আবু তালিবের উপর। হযরত আবু তালিব স্বীয় ভাইপোকে আপন ছেলেদের মতো গভীর স্নেহ-মমতায় পালন করতে থাকেন। এ সময়েও অনেক অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়। প্রত্যহ প্রত্যুষে হযরত আবু তালিব মহানবী (দ.) সহ স্বীয় পুত্রদের নিয়ে একসঙ্গে বসে নাশতা করতেন। রাতে ঘুমানোর সময় আবু তালিবের সন্তানদের চুল উসকো খুসকো হয়ে যেত। অথচ মহানবী (দ.) এর পবিত্র চুল মোবারক থাকত অত্যন্ত পরিপাটি। মনে হতো যেন এই মাত্র চিরুনি দিয়ে ব্রাশ করা হয়েছে। একবার মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। চারিদিকে অভাব এবং হাহাকার। মক্কার নেতৃস্থানীয় লোকজন হযরত আবু তালিবের সমীপে কাবাগৃহে উপস্থিত হয়ে কাবার মালিকের নিকট ফরিয়াদ পেশ করার আবেদন জানান। আবু তালিব কাবাগৃহে গমনের সময় কিশোর ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত মুহাম্মদ (দ.) কেও সঙ্গে নিয়ে যান। তিনি মহানবী (দ.) কে সঙ্গে নিয়ে কাবা গৃহের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসেন। তখন একান্ত অনুনয় বিনয় করে আকাশের দিকে ইঙ্গিত পূর্বক ফরিয়াদ করেন। তখন আকাশে মেঘের কোন চিহ্ন ছিল না। অথচ মুহূর্তেই বৃষ্টি নেমে আসে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে সমস্ত নালা-খালে পানি প্রবাহিত হতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু তালিব বলেন, “তাঁর [মহানবী (দ.)] চেহারা এতোই উজ্জ্বল ও আলোকময় যে, ঐ চেহারার বরকতে আল্লাহর কাছ থেকে বৃষ্টি চাওয়া যায়।”

রাসূলুল্লাহ (দ.) এর বয়স তখন বার বৎসর। হযরত আবু তালিব কুরাইশ কাফেলার সঙ্গে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমনের সিদ্ধান্ত নেন। কিশোর মহানবী (দ.) চাচার সঙ্গে সিরিয়া গমনের বায়না ধরেন। পথকষ্ট এবং বিভিন্ন অসুবিধার কথা চিন্তা করে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে নিতে রাজী ছিলেন না।

কিন্তু মহানবী (দ.) মনোকষ্ট পাবেন মনে করে আবু তালিব সুপ্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে নেন। বাণিজ্য কাফেলা বসরা পৌঁছালে বিশ্বামের আয়োজন চলে। তখন এ স্থানে বসবাস করতেন বিখ্যাত খ্রিস্টান দরবেশ জারজীস ওরফে বাহীরা। দরবেশ বাহীরা আসমানী কিতাব সমূহ সম্পর্কে অত্যন্ত পারদর্শী-জ্ঞানী ছিলেন। এমনিতে দরবেশ বাহীরা স্বীয় গৃহ থেকে বাইরে আসেন না। এ দিন তিনি হঠাৎ বাইরে আসেন এবং লক্ষ্য করেন যে, কাফেলার সঙ্গে আগত কিশোর মূলতঃ অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি মহানবী (দ.) যাঁর বর্ণনা পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবে উল্লেখ আছে। বাহীরা এ কিশোরের সম্মানে সমস্ত কাফেলার জন্য এ দিন ভোজের আয়োজন করেন। বাহীরা দরবেশ নিজে গৃহের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে কিশোর মহানবী (দ.) কে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং এক পর্যায়ে মহানবীর (দ.) পৃষ্ঠদেশ পর্যবেক্ষণ করে মোহরে নবুয়ত নিশ্চিত হন। এ পর্যায়ে তিনি কিশোরের অভিভাবকের খোঁজ নেন এবং তাঁকে নিয়ে সিরিয়া গমন করতে নিষেধ করেন। কারণ ইহুদীরা এ কিশোরের সন্ধানে বেরিয়ে গেছে এবং পাওয়া মাত্র হত্যা করবে। বাহীরার পরামর্শে হযরত আবু তালিব মহানবী (দ.)কে দু'জন সঙ্গীসহ মক্কায় ফেরৎ পাঠান।

মহানবী (দ.) তখন বয়সে তরুণ। কাবা শরিফের সংস্কার কাজ চলছিল। কুরাইশ বংশের সকল গোত্র থেকে লোকজন সংস্কার কাজে সহযোগিতার জন্য অংশগ্রহণ করে। তরুণ মহানবী (দ.)ও চাচাদের সঙ্গে ইট বহন করে সহযোগিতা করছিলেন। অনেকে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার জন্য এবং ইট বহনে সুবিধার জন্য লুঙ্গি উপরে উঠিয়ে কাঁধের সঙ্গে জড়িয়ে কাজ করছিলেন। মহানবী (দ.) তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) এর সঙ্গে ইট বহনের কাজ করছিলেন। এক পর্যায়ে হযরত আব্বাস স্বীয় লুঙ্গি কাঁধে পেঁচিয়ে নিয়ে কাজ করছিলেন। একইভাবে তিনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে লুঙ্গি কাঁধে পেঁচিয়ে ইট বহন করতে আহ্বান করলেন। চাচার আহ্বানে মহানবী (দ.) লুঙ্গি উপরে উঠাতেই গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং নির্দেশ আসে, “হে মুহাম্মদ (দ.) আপনি লুঙ্গি উঠাবেন না।” গায়েবী নির্দেশ পাওয়া মাত্র মহানবী (দ.) বেহঁশ হয়ে যান। আল্লাহর সরাসরি আশ্রয়ে থাকা মহানবী (দ.) এর ইজ্জত, আব্রু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বমহিমায় সংরক্ষণ করেছেন।

আরেকবার রাতে এক পড়শী যুবকের সঙ্গে অবস্থান করছেন। তখন মক্কায় বিভিন্ন স্থানে রাতে তরুণ যুবকরা বসে নানা রকম খোশ-গল্প এবং আড্ডা করত। মহানবী (দ.) একরাতে তা শোনার আশ্রয় প্রকাশ করে পড়শী যুবককে অবহিত করে আড্ডাস্থলে গমন করেন। আশ্চর্যের বিষয় অদূরে বসে

খোশগল্প শোনার আশ্রয় নিয়ে গেলেও বসামাত্র মহানবী (দ.) ঘুমিয়ে পড়েন। সারারাত ওখানে কি হয়েছে না হয়েছে এ সম্পর্কে তিনি মোটেই অবহিত হন নি। তার যখন ঘুম ভাঙে তখন ভোর হয়ে যায়। আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম নবীকে এভাবেই স্বীয় আশ্রয়ে রেখে প্রবৃত্তিমুক্ত রাখেন।

আরবের গোত্র সমূহের মধ্যে সামাজিক আধিপত্য এবং গোষ্ঠীগত কর্তৃত্বের দ্বন্দ্ব সংঘাত একটি স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে চলে আসছিল। এ সকল সংঘাত বংশানুক্রমিক যুদ্ধে রূপ নিত। এ ধরনের একটি যুদ্ধ হচ্ছে ‘হারবুল ফুজ্জার’। হারবুল ফুজ্জার অর্থ হচ্ছে অবাধ্য মানুষের যুদ্ধ। যে মাসে আরব ঐতিহ্য এবং সামাজিক সংস্কৃতি ও রীতি অনুযায়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ অপরাধ অন্যায় এমনকি হারাম ছিল এ যুদ্ধ সে সকল মাস সমূহ সমেত পাঁচ বছরব্যাপী সংঘটিত হওয়ায় এ যুদ্ধকে হারবুল ফুজ্জার বলা হয়। এ যুদ্ধ কুরাইশ এবং বনী কায়স গোত্রের মধ্যে সংঘটিত হয়। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী উভয় পক্ষই ছিল আল্লাহর অবাধ্য। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) তখন কিশোর। চাচাদের নির্দেশের কারণে কোনো কোনো দিন মহানবী (দ.)ও যুদ্ধে যেতেন। তবে তিনি এ যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেন নি। এ যুদ্ধে তিনি মাঝে মধ্যে নিজ চাচাদেরকে শুধু মাত্র তীর উঠিয়ে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম নবীকে অন্যায় যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ থেকে হেফাজতে রেখে ন্যায়-অন্যায় ভেদরেখা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেছেন।

মহানবী (দ.) এর বয়স যখন বিশ বছর তখন পারস্পরিক সন্ধির ভিত্তিতে হারবুল ফুজ্জার বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় আরবের জনগণের মধ্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অন্যায় অপকর্ম বিরাজমান ছিল। দীর্ঘ সময় ধরে গোত্রগত যুদ্ধে জর্জরিত আরবরা অনর্থক রক্তপাত এবং মৃত্যু ব্যতীত কোন কিছু অর্জন করতে পারে নি। এ ধরনের বিষয় সম্পর্কে কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের অসারতা ও অপ্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলাপ করে শান্তি, সদ্ভাব, শৃঙ্খলা, পারস্পরিক সহমর্মিতা, সততা এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ হবার উদ্যোগ নেন। তরুণ মহানবী (দ.) এ ধরনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে স্বাগত জানিয়ে তরুণ যুবকদেরকে সংগঠিত করেন। এ সংগঠনের নাম দেয়া হয় ‘হিলফুল ফুযল’। সর্ব সম্মতিক্রমে এ সংগঠনের নীতিমালা হিসেবে ঘোষণা করা হয় যে, নির্যাতিত মজলুমদের সাহায্য প্রদান, অত্যাচারী-জালিমদের মক্কার নিরাপদ এলাকায় প্রবেশ করতে না দেয়া, আত্মীয় অনাত্মীয় নিজ গোত্র, ভিন্ন গোত্র, দেশী-বিদেশী নির্বিশেষে সব শ্রেণি পেশার মানুষের সাহায্য ও নিরাপত্তা প্রদান। এ ধরনের চুক্তি ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নে

মহানবী (দ.) যুবক-তরুণদেরকে সবচেয়ে বেশি প্রেরণাদীপ্ত করেছিলেন। নবুয়ত প্রকাশের পর এ ধরনের চুক্তি বিষয়ে মহানবী (দ.) উল্লেখ করেন, “ইসলামী যুগেও যদি এ ধরনের একটি চুক্তি তথা শপথনামার জন্যে আমাকে ডাকা হয়, তা হলে আমি অবশ্যই তা কবুল করবো।”

তারুণ্য পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে মহানবী (দ.) স্বীয় সততা নৈতিকতা এবং অসাধারণ চারিত্রিক গুণাবলীর কারণে মক্কার জনসাধারণ কর্তৃক আল-আমীন (পরম বিশ্বস্ত) উপাধি লাভ করেন। তখন লোকজন এমনকি মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে তাঁকে মূল নামের পরিবর্তে আল-আমীন নামেই ডাকত।

দাদার ইস্তিকালের পর মহানবী (দ.) চাচা হযরত আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে পরিবারের অন্যতম সদস্য হিসেবে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। চাচার পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি। তদুপরি তখন চাচা হযরত আবু তালিবের আর্থিক অবস্থা ভাল যাচ্ছিল না। চাচার পরিবারে সাহায্য সহযোগিতা করার মানসে মহানবী (দ.) আর্থিক ব্যবস্থায় আত্মনিয়োগ করেন। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন লোকের বকরি চরাতেন। মহানবী (দ.) বলেছেন, “আমি কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরি চরিয়েছি।” বকরি চরানোর হাকীকত অন্যান্য পশু চরানো থেকে ভিন্ন অর্থবোধক বিষয়। উট-গরু প্রভৃতি জন্তু চরানো অনেক সহজ। কিন্তু বকরি চরানো অনেক কঠিন। বকরির স্বভাব হচ্ছে চারণভূমির সর্বত্র ঘুরে ফিরে খাদ্য জোগাড় করা। এখন এ ভূমিতে, মূহুর্তে অন্যভূমিতে চলে যাওয়া বকরির স্বভাব। এ ছাড়া দৌড়ানো বকরির অন্যতম স্বভাব। কিছু বকরি এক দিকে দৌড়ালে দেখা যায় আর কিছু অন্য দিকে দৌড়ায়। তাই বকরি চরানোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সদা সতর্ক থাকতে হয়। এ ছাড়া কোন একটি বকরি দলছুট হলে তা শিকারের জন্য নেকড়ে প্রস্তুত থাকে। এ ধরনের একটি কষ্টসাধ্য এবং কঠিন দায়িত্ববোধ সম্পন্ন কাজ মহানবী (দ.) করেছেন। এ বিষয়ে তফসীরকারকদের অভিমত হচ্ছে আল্লাহ তাঁর প্রায় সকল নবী-রাসূলদের দিয়ে বকরি চরিয়েছেন। কারণ বকরি চরানোর মাধ্যমে উম্মতকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার প্রশিক্ষণ স্বয়ং আল্লাহ নবীদেরকে দিয়ে থাকেন। নবী-রাসূলগণ উম্মতের নফস নিয়ন্ত্রক এবং শয়তানের প্রলোভন-দুরভিসন্ধি-প্ররোচনা-কুমন্ত্রণা থেকে উম্মতকে রক্ষার সুকঠিন দায়িত্ব নিয়ে নবী হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করেন। মহানবী (দ.) বাস্তবজীবনে এ ধরনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছিলেন আল্লাহর আশ্রয়ে থেকে। বকরি চরানো থেকে উপার্জিত অর্থ তিনি হযরত আবু তালিবের পরিবারে প্রদান করতেন। এটি একটি সামাজিক দায়িত্ব ও

কর্তব্যের নমুনা।

দ্বিতীয়বার মহানবী (দ.) সিরিয়া সফর করেন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে। চতুর্দিকে মহানবীর (দ.) সুনাম, সুখ্যাতি এবং বিশ্বস্ততা, দায়িত্ববোধে ও আমানতদারীত্বের সংবাদ লোকমুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। সর্বত্রই তাঁর নাম ‘আমীন’ হিসেবে সম্বোধিত হতে থাকে। লোকমুখেই মহানবী (দ.) এর চারিত্রিক সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যের সংবাদ হযরত খাদিজার নিকটও পৌঁছে। হযরত খাদিজা হলেন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ধনী ব্যবসায়ী মহিলা। তাঁর বংশমর্যাদা, নম্রতা, পবিত্রতা এবং নৈতিকতার কারণে জাহিলী যুগেও তিনি ‘তাহিরা’ নামে অভিহিত হতেন। কুরাইশ বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের সঙ্গে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে তাঁর বাণিজ্য বহরও শরীক থাকতো। তাঁর বাণিজ্য কাফেলার পণ্য সম্ভার এককভাবে অন্য সকল কাফেলার সমান হতো। রাসূলুল্লাহ (দ.) এর বয়স তখন পঁচিশ বছর। মহানবী (দ.) এর সুনাম সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর বিশাল বাণিজ্য বহরের দায়িত্ব হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর উপর অর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেন। খাদিজাতুল কোবরা (রা.) এ প্রস্তাব মহানবী (দ.) সমীপে পেশ করেন। হযরত আবু তালিবের গৃহে তখন আর্থিক সংকট চলছে। আয় উপার্জন খুবই সীমিত। ফলে এ ধরনের প্রস্তাব মহানবী (দ.) পরম দায়িত্বশীলতার সঙ্গে গ্রহণ করেন। এবার হযরত খাদিজার ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ হয়। মহানবী (দ.) সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে যথাযথ ভাবে সমস্ত হিসাব হযরত খাদিজা সমীপে পেশ করেন। মহানবী (দ.) এর সততায় বিমুগ্ধ হয়ে হযরত খাদিজা তাঁকে নির্ধারিত পারিশ্রমিকের চেয়ে আরো অধিক অর্থ প্রদান করে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন।

মক্কা থেকে সিরিয়ার দূরত্ব দীর্ঘ পথের। ফলে পথে পথে বাণিজ্য কাফেলাকে বিশ্রাম নিতে হয়। মহানবী (দ.) হযরত খাদিজার (রা.) গোলাম মায়সারার সঙ্গে বাণিজ্য কাফেলার দায়িত্ব নিয়ে পথ অতিক্রম করছেন। বসরা পৌঁছে তিনি এক ছায়াদার বৃক্ষের নীচে বিশ্রামের জন্য বসেন। এ বৃক্ষের অনতিদূরে ‘নাস্তুরা’ নামে একজন খ্রিস্টান দরবেশ বাস করতেন। এ বৃক্ষের নীচে মহানবী (দ.)কে বিশ্রামরত অবস্থায় দেখে দ্রুত তাঁর সমীপে এসে বলেন, ‘হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতীত এ পর্যন্ত এ বৃক্ষের নীচে অন্য কেউ কোন দিন বসেন নি। আপনি ছাড়া আর কোন নবী এখানে অবতরণ করেন নি। এরপর নাস্তুরা দরবেশ মায়সারাকে লক্ষ্য করে বলেন ‘তাঁর দু’চোখে ঐ রক্তিম আভা দেখতে পাচ্ছি- যা পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত হয়েছে’। জবাবে মায়সারা উল্লেখ করেন এ রক্তিম আভা তাঁর চোখ থেকে কখনো পৃথক

হয় না। তখন নাস্তুরা দরবেশ উল্লেখ করেন, “তিনিই তিনি, ইনিই নবী; ইনিই শেষ নবী।” আল্লাহ তাঁর আশ্রয়ে লালিত মহানবী (দ.)কে এভাবে পুণ্যবান লোকদের নিকট পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, যাতে তাঁর সম্পর্কে কিছু মানুষ হলেও প্রকৃত তথ্য অবহিত হতে পারেন।

বাণিজ্য কাফেলা বিশাল অংকের মুনাফা করে সিরিয়া থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কাফেলায় থাকা হযরত খাদিজার ভৃত্য মায়সারা লক্ষ্য করলেন দুপুরের খর রোদ এবং প্রখর সূর্যতাপের মধ্যে দু’জন ফিরিশতা মহানবী (দ.) কে ছায়া দিয়ে চলেছেন। ফিরিশতাদের এ ছায়াসঙ্গ হযরত খাদিজার গৃহে পৌছানোর সময় পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। হযরত খাদিজা স্বয়ং এ দৃশ্য অবলোকন করে আশ্চর্য হয়ে যান এবং আশেপাশের মহিলাদেরকেও তা দেখান। মায়সারা স্বয়ং দীর্ঘ সফরের বিস্তারিত বিবরণ অবহিত করেন, তখন হযরত খাদিজা অভিভূত হয়ে যান। মুনাফার বিশাল অংক লক্ষ্য করে তিনি মহানবী (দ.)কে নির্ধারিত পারিশ্রমিকের চেয়ে অনেক বেশি পারিশ্রমিক প্রদান করেন।

মহানবী (দ.) সম্পর্কে সবকিছু জ্ঞাত হয়ে হযরত খাদিজা (রা.) বিষয়টি তাঁর চাচাতাই তত্ত্বজ্ঞানী ওরাকা ইবনে নওফেলকে অবহিত করেন। সফরকালীন সময়ে নাস্তুরা দরবেশ এর বর্ণনা, চলার পথে ফিরিশতাদের ছায়াদান প্রভৃতি অলৌকিক বর্ণনা শ্রবণ করে ওরাকা বলেন যে, ইনি উম্মতের নবী হবেন- যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহে উল্লেখিত আছে। মহানবী (দ.) সম্পর্কে এ ধরনের বিষয় অবহিত হবার পর হযরত খাদিজা তাঁকে বিবাহ করার জন্যে আত্মহ প্রকাশ করেন। ফলে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের দু’মাস ২৫দিন পর হযরত খাদিজা স্বয়ং মহানবী (দ.) সমীপে বিবাহের প্রস্তাব দেন। মহানবী (দ.) বিষয়টি তাঁর চাচা হযরত আবু তালিবকে জানান। হযরত আবু তালিব বিবাহে সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করলে উভয়পক্ষের পারিবারিক সদস্যদের উপস্থিতিতে এ পবিত্র বিবাহ সম্পন্ন হয়। তখন মহানবী (দ.) এর বয়স ২৫ বৎসর আর হযরত খাদিজার বয়স চল্লিশ বৎসর। এ পর্যায়ে মহানবী (দ.) এর জীবনে নতুন অভিযাত্রার সূত্রপাত ঘটে।

মহানবী (দ.) এর বয়স তখন পঁয়ত্রিশ বছর। পুরোনো কাবা গৃহ মেরামত এবং দেয়াল উঁচু করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বৃষ্টির পানি কাবা গৃহের ভিতরে প্রবেশ করতো। ফলে তা অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতো। কুরাইশরা বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে পুনঃনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে শুধুমাত্র হালাল উপার্জনের মাল-সম্পদের মাধ্যমে কাবা গৃহের পুনঃনির্মাণ সম্পন্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কুরাইশদের সকল গোত্র যাতে এ পবিত্র গৃহ পুনঃনির্মাণে সমভাবে শরিক হতে পারে সে জন্যে গৃহের বিভিন্ন অংশ নির্মাণের দায়িত্ব বন্টন করে সামাজিক সম্প্রীতি ও সমতা রক্ষা করা হয়। নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে ‘হাজরে আসওয়াদ’ পাথর প্রতিস্থাপনের প্রসঙ্গ এসে যায়। এ পাথর বসানোর বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। সকল গোত্রই এ পাথর বসাতে তীব্র বাসনা পোষণ করে। বিভিন্ন রকমের মতভিন্নতার কারণে ‘হাজরে আসওয়াদ’ প্রতিস্থাপনে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল না। এ বিষয়ে অনেকে তরবারি কোষযুক্ত করার ঘোষণাও দেন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কুরাইশদের অন্যতম মুরব্বী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি আবু উমাইয়া ইবনে মুগীরা মাখযুমী ঘোষণা করেন ‘কাল ভোরে যিনি সর্বপ্রথম মসজিদে হারামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করবেন তাকেই সিদ্ধান্তকারী হিসেবে মেনে নিলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। প্রত্যুষে সকলে কাবা গৃহে এসে লক্ষ্য করলেন মসজিদে হারামে প্রথম প্রবেশকারী হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (দ.)। সকলে তাঁকে দেখে হতবাক হয়ে বলে উঠলেন, “এই তো মুহাম্মদ, আমরা সবাই তাঁকে সালিশ মানতে সম্মত। তিনিই তো মুহাম্মদ আল আমীন।”

মহানবী (দ.) এ পর্যায়ে একটি চাদর চেয়ে নেন। হাজরে আসওয়াদকে চাদরে রেখে তিনি বলেন, “প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ এ চাদর ধরুন যাতে কোন সম্প্রদায় এ সম্মানজনক মহতী কাজ থেকে বাদ না পড়েন। তাঁর এই ফয়সালা সকলের পছন্দ হয় এবং সম্মিলিতভাবে সকলে মিলে কাবাগৃহে তৃতীয় বারের মতো ‘হাজরে আসওয়াদ’ প্রতিস্থাপন করা হয়। মক্কার বড় বড় নেতৃবৃন্দ যে ফয়সালা দিতে পারেন নি আল্লাহর সরাসরি আশ্রয়প্রাপ্ত মহানবী (দ.) অবলীলায় তা করতে সক্ষম হন। উল্লেখ্য যে মহানবী (দ.) স্বয়ং তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে তা যথাস্থানে বসিয়ে দেন।

পঁচিশ বছর বয়সে মহানবী (দ.) এর সঙ্গে খাদিজার (রা.) বিবাহ সম্পন্ন হয়। প্রচলিত ধারায় লক্ষ্য করা যায় বিবাহের পর যে কোন পুরুষ বা রমণী নিজের সংসার গুছানোর দিকে মনোনিবেশ করে থাকেন। অর্থাৎ পূর্ণমাত্রায় সংসারী হন। ধন-সম্পদ উপার্জনের দিকে মনোনিবেশ করে থাকেন। পরিবারের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির জন্যে যে কোন পুরুষ মেধা-শ্রম বিনিয়োগ করে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করেন। কিন্তু মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পরিপূর্ণ আশ্রয়ে এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠা মহানবী (দ.) বিবাহের পর ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় আত্মগম্ব হয়ে পড়েন। সংসার পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় কার্যাদি নির্বাহের দায়িত্ব তিনি পুণ্যবান স্ত্রী হযরত খাদিজার (রা.) উপর ন্যস্ত করে পারান পর্বতের হেরা গুহার

মধ্যে গমনাগমন শুরু করেন। সংসারের প্রতি নির্লিপ্ত আচরণ এবং হেরা গুহায় গমন করে একাকী নির্জন সাধনার বিষয়ে হযরত খাদিজা (রা.) কখনো বিন্দু পরিমাণ অতৃষ্টি প্রদর্শন করেন নি, বরং এ পথে সাধনা পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করেন। অনেক সময় এমনও হতো মহানবী (দ.) হেরা গুহায় একাদিক্রমে অহর্নিশ অবস্থান করতেন। তখন হযরত খাদিজা (রা.) নিজে সুউচ্চ পাহাড়ের হেরা গুহায় মহানবীর (দ.) জন্যে প্রয়োজনীয় রসদ নিয়ে হাজির হতেন। অনেক সময় মহানবী (দ.) কয়েকদিনের রসদ এক সঙ্গে নিয়ে যেতেন। মহানবী (দ.) এর নির্জন সাধনা বিষয়টি পরিবারের সদস্য ব্যতীত অন্য কেউ তেমন জানত না। মহানবী (দ.) প্রতি বছর সুনির্দিষ্ট সময়ে হেরা গুহায় গমন করে ধ্যানমগ্ন হতেন। তবে তিনি কতো বৎসর এ ধরনের নির্জন সাধনায় সময় অতিবাহিত করেছেন এর সঠিক তথ্য উপস্থাপিত হয় নি। তবে অনেকের বর্ণনা মতে এ ধরনের নির্জন সাধনা পনের বৎসর পর্যন্ত চলে। এ ধরনের সাধনা বিষয়ে পবিত্র কুরআন ঘোষণা দিয়েছে, “সুতরাং যখনই অবসর পাও সাধনায় লিপ্ত হও এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করো।” (সূরা ইনশিরাহ : ৯৪:৭-৮)। হেরা গুহার নির্জন সাধনার অনুশীলন হিসেবে পবিত্র রমজান মাসে ‘ইতেকাফ’ এর নিয়ম প্রচলিত হয়েছে বলে অনেক তত্ত্বজ্ঞানী মত প্রকাশ করে থাকেন।

পারান পর্বতের হেরা গুহায় মহানবী (দ.) কতো সময় নির্জন আরাধনায় ব্যয় করেছেন, কতো তানহায়ী রাত জনমানব শূন্য গিরি গুহায় অতিবাহিত করেছেন এর কোন হিসাব নেই। তবে হঠাৎ একদিন তনুয় ভেঙ্গে দিলেন ফিরিশতা সর্দার, আল্লাহর ওহী বাহক হযরত জিবরাঈল (আ.)। বলে উঠলেন- পড়ুন! (পাঠ করুন), আপনার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন নিষিক্ত ডিম থেকে। পড়ুন! আপনার প্রতিপালক মহান দয়ালু। যিনি মানুষকে জ্ঞান দিয়েছেন কলমের। আর মানুষকে শিখিয়েছেন, যা সে জানত না। অথচ মানুষ যখনই নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে করতে শুরু করে, তখনই সে সীমালংঘন করে। কিন্তু মনে রেখো, প্রত্যেককে অবশ্যই তার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে”- (সূরা আলাক: ৯৬:১-৮)। ওহী আসার প্রথম দিন বিচলিত মহানবী (দ.) এর সঙ্গে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর কথোপকথন সম্পন্ন হবার এক পর্যায়ে মহানবীকে সজোরে চেপে ধরে আলিঙ্গনবদ্ধ হন। এর পরে ধীরে-দ্রুত উভয় নিয়মে ওহী আসতে শুরু করে। প্রকাশ হয়ে পড়ে শেষ নবী, সকল মানুষের নবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর উনুজ নবুয়ত।

মহানবী (দ.) এর নিকট প্রথম প্রত্যাদেশ আসে হেরা গুহায়। অথচ কাবা গৃহের মতো পৃথিবীর প্রথম স্থাপনায়ও মহানবী (দ.) ইবাদত করেছেন। তাওয়াফ করেছেন। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর ওহী প্রেরণের ক্ষেত্রে কাবা গৃহের মতো জনাকীর্ণ নয় বরং জনশূন্য হেরা গুহাকেই নির্ধারিত করেছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ নিজেই তাসাওউফ সাধনার ক্ষেত্রে নির্জন এবং নিঃসঙ্গ সাধনার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তা ছাড়া আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে আরাম-আয়েশ নয় বরং কষ্টসাধ্য সাধনার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত হয়েছে। হেরা গুহায় সাধনা কালে হযরত বিবি খাদিজা (রা.) মহানবীর আহার-আপ্যায়নের লক্ষ্যে সুউচ্চ গুহায় অতি কষ্টে বার বার গমন করেছেন। এ ধরনের ত্যাগ তথা তাসাওউফ সাধনার জন্যে পারিবারিক সমর্থনও যে অত্যাবশ্যিক তা স্পষ্ট করা হয়েছে। হেরা গুহায় মহানবী (দ.) এর ধ্যানমগ্ন সাধনার চিত্র পরবর্তী সময়ে তাসাওউফ সাধনার ধারা সৃষ্টিতে নজীর হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

মহানবী (দ.) এর নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে ব্যক্তিগত, সামাজিক প্রভৃতি বিষয়ে যে আচার-আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা তাসাওউফ পর্যায় হিসেবে নির্ধারণ করা যায়। এ সময়ে মহানবী (দ.) এর চারিত্রিক সৌন্দর্য, অতুলনীয় নৈতিক মান, শিষ্টাচার, সদাচার, আমানতদারীত্বের মধ্যে ঈমানী তেজ সকলকে মোহিত করে। নবুয়ত প্রকাশের পর ওহীর সরাসরি নির্দেশনায় তিনি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন। মানবজাতিকে হেদায়তের পথে প্রকাশ্যে আহ্বান জানানোর সুকঠিন দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে সততা, নৈতিকতা, আদর্শবোধ, পরার্থপরতা, কল্যাণময়তা, সংযম, ধৈর্য, সহনশীলতা, শ্রুষ্টি এবং সৃষ্টির প্রতি প্রেম-ভালবাসা, কোনপ্রকার অনুরাগ-বিরাগ-আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত কামনা-বাসনামুক্ত মনে এক আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। এ ধরনের প্রশিক্ষণ তিনি মসজিদে নববীতে বসে আসহাবে আস-সুফ্যাদের যেমন প্রদান করেছেন, তেমন সাহাবাদের সঙ্গে বৃহৎ মজলিসে মিলিত হয়ে হযরত ওয়ায়েস করণীর (ক.) মতো আল্লাহ রাসূলের একান্ত প্রেমিকের সুঘাণ প্রাপ্তির খোশ খবরও জানিয়েছেন। তিনি সাহাবাদেরকে সালাত কায়েমকালে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে, সামাজিক সম্পর্ক এবং লেনদেনে, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিচারসাম্য, মানবসাম্য, মানবের প্রতি অভেদ আচরণ প্রদর্শন, অঙ্গীকার রক্ষা ও পালনের যে সকল নির্দেশিকা আক্ষরিক অর্থে প্রদান করেছেন তাঁর প্রতিটি কথা ও কর্মের সওগাত হচ্ছে তাসাওউফ। অর্থাৎ বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি

অর্জনের লক্ষ্যে নিজকে নিবেদিত ও সমর্পিত করার প্রশিক্ষণ ও দিক নির্দেশনা মহানবীর (দ.) জীবন থেকে তাঁর আহলে বাইত এবং সাহাবারা অর্জন করেছেন। এ জন্যে পবিত্র কুরআন মহানবী (দ.) কে লক্ষ্য করে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছে, “তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকাল দিবস কামনা করে, তাদের জন্যে আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ”- (সূরা আল আহযাব:৩৩:২১)।

তাসাওউফ সন্ন্যাস ব্রত নয়। তবে তাসাওউফ হচ্ছে পার্থিব মোহ-ভালবাসা-কামনা-বাসনামুক্ত পরিপূর্ণ সদাচারী জীবন ব্যবস্থা। তাসাওউফের মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে কপটতা ভগ্নামীমুক্ত, শ্বেত-শুভ্র-নির্মল অন্তর সৃষ্টি করে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির সঙ্গে পরিপূর্ণ সৎ জীবন যাপনে সদা তৎপর থাকা। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে, “এরপর ধারাবাহিকভাবে আমি রাসূলদের পাঠিয়েছি। শেষে পাঠালাম মরিয়মপুত্র ঈসাকে। তাঁকে দিয়েছিলাম ইঞ্জিল। আর তাঁর অনুসারীদের অন্তরে সহমর্মিতা ও দয়ার সঞ্চারণ করলাম। কিন্তু আমি বিধিবদ্ধ না করা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের জন্যে বৈরাগ্যবাদ চালু করল। অথচ তাও তারা যথাযথভাবে পালন করে নি। ওদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করেছিল, আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম পুরস্কার। কিন্তু অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী”-(সূরা হাদিদ:৫৭:২৭)। উপর্যুক্ত আয়াতে মানব জাতির জন্যে সন্ন্যাসব্রত পালনকে আল্লাহ সরাসরি বিধিবদ্ধ করেন নি। তবে “আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের জন্যে বৈরাগ্যবাদ চালু করল। অথচ তাও তারা যথাযথভাবে পালন করে নি। ওদের মধ্যে যারা (অর্থাৎ যারা বৈরাগ্যবাদ অনুশীলন করেছেন) বিশ্বাস করেছিল, আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম উত্তম পুরস্কার”। আয়াতের এ অংশ নিঃসন্দেহে ‘সব ছেড়ে দে মাওলা বলে’; তথা একমাত্র আল্লাহ-পাগল বান্দাদের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে। অর্থাৎ এ পথ সকলের জন্যে উন্মুক্ত নয়।

এ বিষয়ে মহানবী (দ.) এর সাহাবা হযরত উসমান ইবন মাজুন (রা.) এর ঘটনা উল্লেখ করা যায়। হযরত উসমান ইবন মাজুন (রা.) ছিলেন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) এর ভগ্নীপতি এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.) এর মামা। হযরত উসমান (রা.) এবং তাঁর স্ত্রী খাওলা অত্যন্ত আদর্শবাদী এবং সর্বত্যাগী দম্পতি ছিলেন। উসমান সব সময় নিজেকে ধর্মকর্মে নিযুক্ত রাখতেন এবং তিনি রাসূলের (দ.) কাছে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। রাসূল তাঁকে শাসন করে বলেছিলেন, “তুমি কি আমার মধ্যে একটি আদর্শ খুঁজে পাও না? আমি আমার স্ত্রীদের কাছে যাই, আমি

আহার্য গ্রহণ করি, আমি রোজা রাখি এবং রোজা ভেঙ্গে ইফতার করি। তুমি প্রতিদিন রোজা রাখ এবং সারারাত জেগে উপাসনা কর। এটা কখনো করবে না। মনে রাখবে তোমার উপর তোমার চোখের অধিকার আছে, তোমার শরীরের একটি অধিকার আছে এবং তোমাদের পরিজনদের একটি অধিকার আছে। সুতরাং উপাসনা কর এবং নিদ্রার সময় নিদ্রা যাও, রোজা রাখ এবং অন্যসময় আহার্য গ্রহণ কর।” মহানবী (দ.) উপর্যুক্ত নির্দেশনা সমূহ আল্লাহর ওহী অনুসারেই দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে, “এবং আল্লাহ তোমাকে মাতৃগর্ভ থেকে নির্গত করেছেন যখন তুমি কিছুই জানতে না। কিন্তু তিনি তোমাকে শ্রবণ শক্তি দিয়েছেন, দৃষ্টি দিয়েছেন এবং মন দিয়েছেন। যেন তুমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে পার”-(সূরা আন নহল:১৬:৭৮)। হযরত উসমান ইবন মাজুন (রা.) ইতিকালের পর তাঁর জানাযার পূর্বে রাসূলে খোদা (দ.) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) কে নিয়ে হযরত খাওলাকে দেখতে যান। তিনি উসমানের কপাল চুম্বন করেন এবং তাঁর চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে থাকে।

মহানবী (দ.) নির্দেশিত তাসাওউফ পন্থা সন্ন্যাসব্রত থেকে অনেক কঠিন। মহানবী (দ.) পৃথিবীতে থেকে পার্থিব জীবনের উপকরণ ভোগ করে পার্থিব মায়ার বন্ধন থেকে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে মুক্ত রেখে শুধুমাত্র আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্যে নিজেকে সর্বাবস্থায় উৎসর্গ করার অবস্থানে সুদৃঢ় থাকার জীবন ধারাকে তাসাওউফ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

উপর্যুক্ত আয়াতের মর্মার্থের আলোকে আল্লামা রুমী (রহ.) বলেছেন, “আল্লাহকে ভুলে যাবার নাম দুনিয়া, সংসার সামগ্রী টাকা পয়সা স্ত্রী পুত্র দুনিয়া নহে।” (চলবে)

সুফি উদ্ধৃতি

- যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'য়ালার সত্যিকারের পরিচয় লাভ করেছেন, তিনি কখনো একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার জিকিরের উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে মুখ খুলতে পারেন না।
- আল্লাহ্ তা'য়ালার যাদের ভালবাসেন তাঁদের তিনটি স্বভাব দান করে থাকেন। ক. সমুদ্রের দানশীলতার মত দানশীলতা, খ. সূর্যের দয়ার মত দয়া এবং গ. জমিনের নশতার মত নশতা।
- নেককারের সংসর্গে থাকা, নির্জনে বসে নেক কাজ করার চেয়ে উত্তম। আর বদকারের সংসর্গে থাকা বদকাজ করার চেয়ে নিকৃষ্ট।

--- হযরত বায়জীদ বোস্তামী (রহ.)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা.)

মোঃ গোলাম রসুল

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা.)-এর

জন্ম ও বংশ পরিচয় :

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, হযরত সাওদা (রা.) ৫৭৪ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে আরবের বিখ্যাত কোরায়েশ বংশের এক বিশিষ্ট শাখা বনি নাজ্জার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল জামআ কারশিয়া। তিনি উচ্চ বংশীয় ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর মাতার নাম শামুস বিনতে কায়েস। তাঁর দেহের গঠন ছিল দীর্ঘ। তবে তিনি একটু মোটা ছিলেন; তাই তিনি ধীর গতিতে চলাফেরা করতেন। বাল্যকালেই রূপে গুণে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, অথচ বংশ গৌরবের কারণে কিছুটা আত্মাভিমानी ছিলেন।

প্রথম বিয়ে

হযরত সাওদা (রা.)-এর প্রথম বিয়ে হয়েছিল তাঁর চাচাতো ভাই সাকরানের সাথে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আত্মীয়দের জুলুম-অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে রাসূল (দ.)-এর পরামর্শ অনুযায়ী এই দম্পতি আবিসিনিয়ায় হযরত করেন। এই আবিসিনিয়াতেই তাঁদের একমাত্র ছেলে আবদুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। যুবক বয়সে তিনি জালুলার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত সাওদা (রা.)-এর দ্বিতীয় বিয়ে

আবিসিনিয়াতে কয়েক বছর অতিবাহিত করার পর তাঁরা আবার মক্কায় ফিরে আসেন। এক রাতে সাওদা (রা.) স্বপ্নে দেখেন যে রাসূল (দ.) তাঁর নিকটবর্তী হয়ে স্বীয় পা দু'খানা তাঁর কাঁধে উঠিয়ে দিলেন। সকালে স্বপ্নটি তাঁর স্বামীর নিকট বর্ণনা করলেন। স্বামী সাকরান (রা.) স্বপ্নের বিবরণ শুনে বললেন, “তা হলে অতি শীঘ্রই আমার মৃত্যু হবে এবং রাসূল করিম (দ.)-এর সাথে তোমার বিয়ে হবে।” কয়েকদিন পর তিনি আবারও স্বপ্নে দেখলেন যে, আকাশে নব চন্দ্রের উদয় হয়েছে এবং হঠাৎ চন্দ্রটি স্থান ত্যাগ করে তাঁরই উপর এসে পড়ল। ভোরে এ স্বপ্ন বৃত্তান্ত তিনি তাঁর স্বামীর নিকট ব্যক্ত করলেন। স্বামী শুনেই বলে উঠলেন, তোমার এ স্বপ্নেও বুঝা যায় সত্যিই আমি অতি শীঘ্রই পরলোকগমন করব এবং আমার পরে তোমার আবার বিয়ে হবে। সাকরান (রা.) সেদিনই অসুস্থ

হলেন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই ইন্তিকাল করলেন। তখন সাওদা (রা.) কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হলেন এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনরাও পাশে থাকল না। এ সময়ে একান্ত নিরুপায় হয়ে তিনি শিশু পুত্রসহ রাসূল (দ.)-এর এক দূর সম্পর্কীয় খালা খাওলার বাড়িতে আশ্রয় নেন। খাওলার অবস্থাও সচ্ছল ছিল না। তবুও ধৈর্য্য, সংযম ও পবিত্রতার মূর্তপ্রতীক সাওদা অভাব-অনটনের মধ্য দিয়েই আল্লাহুতায়ালার রেজামন্দি হাসিলের চেষ্টা করে যেতে থাকেন। হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তিকালের পর নবী (দ.) কষ্টে দিন যাপন করছিলেন। তাছাড়া শিশু কন্যা উম্মে কুলসুম ও ফাতেমার কথা চিন্তা করে তিনি সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকতেন। এমনি সময়ে রাসূল (দ.)-এর খালা খাওলা বিনতে হাকীম নবীগৃহে এসে দেখেন যে তিনি সংসারের যাবতীয় কাজ নিজ হাতেই করছেন। খাওলা বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! বর্তমানে আপনার সংসারে একজন পরিচর্যাকারিণী প্রয়োজন আপনার অনুমতি পেলে সাওদা (রা.)-এর সাথে আপনার বিয়ে দিতে পারি। সাওদা (রা.) খুবই নিরীহ এবং তাঁর স্বভাব-চরিত্র খুবই ভালো। তাঁর মত রমণী আপনার গৃহে আসলে সংসারকে পুনরায় সুন্দররূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন। নবী করীম (দ.) এ প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং সাওদা (রা.) কে খাওলা এই সুসংবাদ দিলেন। জামআ খ্রিস্টান ছিলেন, তবু তিনি বললেন, কোরাইশ বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে আমি রাজি আছি। সাওদা (রা.) ও তাঁর পিতা রাজি হওয়ায় রাসূল (দ.) নিজে তাঁদের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। চারশত দিরহাম মোহরানা ধার্য করে সাওদার পিতা নিজে খুতবা প্রদান করে বিয়ে পড়ালেন। কিন্তু সাওদার ভাই আবদুল্লাহ তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। অবশ্য পরে যখন তিনি ইসলাম কবুল করেন, তখন তাঁর কার্যকলাপের জন্য আফসোস করতেন। বিয়ের পরেই সাওদা (রা.) নবী (দ.)-এর সংসারে চলে আসেন এবং সন্তানদের দেখাশুনা সহ সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। রাসূল (দ.) অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহর নামে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। বিয়ের সময় সাওদা (রা.)-এর বয়স ছিল ৫৫ বছর। এর কিছুদিন পরেই রাসূল (স.)-এর সঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিয়ে সম্পন্ন হয় এবং তখন তাঁর বয়স ছিল ৯ বছর। বিয়ের ৩/৪ বছর পর আয়েশা (রা.) নবী করীম (দ.)-এর সংসারে

আসেন। এমতাবস্থায় সাওদা (রা.) হযরত আয়েশা (রা.) কে নিজের ভগ্নির মত স্নেহ ও যত্নের সঙ্গে যাবতীয় কাজকর্ম বুঝিয়ে শিখিয়ে গড়ে তুলেছিলেন। অপরদিকে আয়েশা (রা.) বলতেন, “সত্যি বলতে কি, আমার মন সদা-সর্বদা সাওদা (রা.)-এর ভিতরেই যেন পড়ে থাকত।” হযরত সাওদা (রা.) রাসূল (দ.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য যে রাত আপনার সান্নিধ্যে থাকা বরাদ্দ আছে, সেই রাতটুকু আমি বিবি আয়েশাকে দান করলাম। সে কুমারী, আল্লাহুতায়াল্লা আপনার সান্নিধ্য ও সাহচর্য দ্বারা তাঁকে অধিক উপকৃত করুন, এটাই আমার কামনা।” রাসূল (দ.) তা শুনে অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, “সাওদা! প্রকৃতই তুমি অনন্য। তোমার মত আর কোনো নারী পৃথিবীতে জন্মেছে বলে আমার মনে হয় না।”

হযরত সাওদা (রা.)-এর বৈশিষ্ট্য

তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয় এবং রাসূল (দ.)-এর প্রতিটি উপদেশ দৃঢ়ভাবে মেনে চলতেন। বিদায় হজ্জের ভাষণদানকালে রাসূল (দ.) স্বীয় স্ত্রীগণকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, “আমার অবর্তমানে তোমরা গৃহে অবস্থান করিও।” সাওদা (রা.) এ আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন এবং রাসূল (দ.)-এর ওফাতের পরেও কোনো দিন গৃহের বাইরে যান নি। তাঁর চরিত্র ছিল নির্মল, হৃদয় ছিল কোমল এবং তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল।

একদিন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে সাওদা (রা.) মাঠের দিকে গমন করেন। ফেরার পথে হযরত ওমর (রা.) তাঁকে চিনে ফেলেন এবং বিষয়টি তাঁরা উভয়ই রাসূল (রা.)-এর সঙ্গে আলোচনা করেন। তার পরেই পর্দার আয়াত নাযিল হয়। সাওদা (রা.) পাঁচটি হাদিস বর্ণনা করেন। তার মধ্যে একটি হাদিস বোখারী শরিফে উল্লেখ আছে।

একবার হযরত ওমর (রা.) এক থলে দিরহাম সাওদা (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। সেগুলো দেখে সাওদা (রা.) বললেন, “খেজুরের থলেতে কি দিরহাম শোভা পায়!” এই বলে তিনি সমস্ত দিরহাম গরীব মিসকিনদের মধ্যে বিলি করে দিলেন।

সাওদা (রা.) শৌখিন রুচির পরিচয় দিতেন। তিনি ফুল ভালোবাসতেন। নিজে একটি ফুলের বাগান করেছিলেন। ফুল ও ফুলের চারা বিক্রয় করে যে অর্থ উপার্জন হতো তা তিনি দীন-দুঃখীকে দান করে দিতেন। সাওদা (রা.)-এর গর্ভে এবং রাসূল (সা.)-এর ঔরসে আর কোনো সন্তান জন্ম লাভ করে নি।

সাওদা (রা.)-এর ইত্তিকাল

রাসূল (দ.)-এর ওফাতের ১৩ বছর পর ৮১ বছর বয়সে হযরত সাওদা (রা.) ইত্তিকাল করেন। মদিনার জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে মতভেদ আছে। ওয়াকিদীর মতে আমির মুয়াবিয়ার শাসনামলে ৫৪ হিজরীতে তিনি ইত্তিকাল করেন। আর ইবনে হাজারের মতে ৫৫ হিজরীতে তিনি ইত্তিকাল করেন। ইমাম বোখারী (রা.) বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ওমর (রা.)-এর খেলাফতের সময় ইত্তিকাল করেন। ১৯৯৬ সনে মদীনার জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে তাঁর কবর জিয়ারত করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহুর এবং অশেষ দরুদ ও সালাম মহানবী (দ.)-এর প্রতি।

সূত্র :

১. নীলুফা ইয়াসমিন, জান্নাতী দশ রমণী, সিদ্দিকিয়া পাবলিকেশনস।
২. মোসাম্মাৎ আমেনা বেগম, দুইশত একত্রিশজন মহিলা সাহাবী ও বেহেশতি রমণীগণ, ঢাকা এমদাদিয়া লাইব্রেরী, বাংলাবাজার, ঢাকা।
৩. বোখারী শরিফ, ইমাম বোখারী (রা.)
৪. ড. ইবনে আশরাফ, ঈমান, আমল-ইলম, রিমঝিম প্রকাশনী, বাংলাদেশ বাংলা বাজার, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ

মাসিক আলোকধারা'র সম্মানিত পাঠকগণ এখন থেকে 'পাঠক পর্যবেক্ষণ' কলামে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত পাঠাতে পারবেন। এতে সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবিক-সামাজিক সমস্যা ও যৌক্তিক সমাধানপূর্ণ মতামতকে স্বাগত জানানো হবে। লেখা সম্পাদকীয় দপ্তরে e-mail: sufialokdhara@gmail.com -এ পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে উত্তরণের উপায় : প্রসঙ্গ মহামারি ॥ মাওলানা এস এম এম সেলিম উল্লাহ ॥

“কোথায় পালাও হে ভাই

করোনা নামি এই মহামারির ডরে!

ধন-সাম্যতাই কেবল শান্তি আনিবে এই ভব সংসারে।

ধর্ম সাম্যতা বিনা কখনো আসিবে না শান্তি ঘরে।

কোথায় পালাও হে ভাই

করোনা নামি এই মহামারি'র ডরে...!”

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

“প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি মেয়াদ রয়েছে। যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে আসতে পারবে।” (সূরা আল আরাফ-৩৪)

“তাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠীকে আমি বিনাশ করেছি, তারা তাদের চাইতে সম্পদে ও জাঁক-জমকে শ্রেষ্ঠ ছিল।” (সূরা মরিয়ম-৭৪)

এই মানব জাতির এখনো কি সময় হয় নাই তারা তাদের কৃতকর্মের দিকে ফিরে একটু চিন্তা করবে!

তারা তো শুধু সৃষ্টির অর্জনের কামনা, সৃষ্টিতে চিরস্থায়ী হওয়ার চিন্তায় নিজের আয়ুর শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে।

অথচ মানবজাতিকে এখানে চিরস্থায়ী হওয়ার, কামনা করার, জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই। যুগে যুগে নবী, অলি, মুনি, ঋষি, অবতার, ধর্ম সংস্কারকগণের শিক্ষা কি ছিল একটু কি বিবেচনা করা প্রয়োজন নয়?

শেষ যুগের মোজাদ্দেদ, বিগত আগত যুগসমূহের মধ্যস্থতাকারী এই পৃথিবীতে শেষ নবীর অবয়বপ্রাপ্ত শেষ প্রতিনিধি, আল্লাহর জাতি নাম এবং নবীজির জাতি নামে সংমিশ্রিত বিশ্ব মেরুর মধ্যধামে আবির্ভূত সেই সুমহান মহাপুরুষ গাউসুল আযম হযরত শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর দর্শন এবং পবিত্র বাণী সমূহ:

ক. হানা আনিল খালক (সৃষ্টির কামনা হতে নিজেকে গুটিয়ে রাখা)

১. নিজের হাতে পাকাইয়া খাও; পরের হাতে পাকানো খাইও না, আমি বার মাস রোজা রাখি, তুমিও বার মাস রোজা রাখিও।

২. কবুতরের মত বাছিয়া খাও। হারাম খাইও না, নিজ সন্তান-সন্ততি নিয়া খোদার প্রশংসা কর।

৩. (তাহার মুরিদান আব্দুর রহমান সাহেবকে তাহার দক্ষিণ হাত দিয়া দক্ষিণ পাশে নির্দেশ করিয়া বলিলেন):- তুমি এই রাস্তা দিয়া বাড়ি চলিয়া যাও। বাম পাশে নির্দেশ করিয়া বলিলেন এই রাস্তায় যাইও না। নিজ ঘরে গিয়া কোরআন তেলাওয়াত করো, আল্লাহর জিকির করো, কোথাও যাইও না।

৪. দুনিয়া দারুল “রেহালত” পাঠশালা, এখানে অত সুন্দর ও বেশি প্রশস্ত ঘরের দরকার কি? দুইদিন বিশ্রাম করার দরকার মাত্র।

৫. নবী করীম সাল্লাল্লাহু সাল্লাম দুনিয়াকে “দারুল হুজন” বলিয়াছেন। আর তুমি বলো সাদী!!!!

আল্লাহর বাণী :

সূরা আল আনআম , আয়াত: ৩২

পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালের আবাস পরহেয়গারদের জন্যে শ্রেষ্ঠতর। তোমরা কি বুঝ না?

সূরাহ আল-হাদীদ ২০

“তোমরা জেনে রেখ, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, পারস্পরিক গর্ব-অহঙ্কার আর ধন-মাল ও সন্তানা দিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র। তার উদাহরণ হল বৃষ্টি, আর তা হতে উৎপন্ন শস্যাদি কৃষকের মনকে আনন্দে ভরে দেয়, তারপর তা পেকে যায়, তখন তুমি তাকে হলুদ বর্ণ দেখতে পাও, পরে তা খড় ভুষি হয়ে যায়। (আর আখিরাতের চিত্র অন্য রকম, পাপাচারীদের জন্য), আখিরাতে আছে কঠিন শাস্তি, আল্লাহ ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোঁকার বস্তু ছাড়া আর কিছুই না।”

যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্যে সেই ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ইহকালের ফসল কামনা করে, আমি তাকে তার কিছু দিয়ে দেই এবং পরকালে তার কোন অংশ থাকবে না। (সূরা আশ্-শূরা , আয়াত: ২০)

রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর বাণী

সাল্ল ইব্বনু সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, জান্নাতের মাঝে এক চাবুক পরিমিত জায়গা দুনিয়া এবং তার মাঝে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। আর আল্লাহর পথে সকালের এক মুহূর্ত কিংবা বিকালের (সন্ধ্যা) এক মুহূর্ত দুনিয়া ও তার মাঝে যা কিছু আছে তার চেয়ে

উত্তম। (বোখারী-৫৯৭৩)

আবদুল্লাহ ইব্নু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার আমার দু' কাঁধ ধরে বললেনঃ তুমি দুনিয়াতে থাক যেন তুমি একজন প্রবাসী অথবা পথচারী। (বোখারী-৫৯৬৮)

আর ইব্নু 'উমার (রা.) বলতেন, তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে সকালের আর অপেক্ষা করো না এবং সকালে উপনীত হলে সন্ধ্যার আর অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার সময় তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য প্রস্তুতি লও। আর তোমার জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি লও। (বোখারী, ই.ফা ৫৯৭৪)

আবদুল্লাহ ইব্নু মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত

তিনি বলেন, একদিন নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন এবং এর মধ্যখানে একটি রেখা টানলেন, যা তাথেকে বের হয়ে গেল। তারপর দু'পাশ দিয়ে মধ্যের রেখার সঙ্গে ভেতরের দিকে কয়েকটা ছোট ছোট রেখা মিলালেন এবং বললেন, এ মাঝের রেখাটা হলো মানুষ। আর এ চতুর্ভুজটি হলো তার আয়ু, যা বেষ্টন করে আছে। আর বাইরে বেড়িয়ে যাওয়া রেখাটি হলো তার আশা। আর এ ছোট ছোট রেখাগুলো বাধা-বন্ধন। যদি সে এর একটি এড়িয়ে যায়, তবে আরেকটি তাকে দংশন করে। আর আরেকটি যদি এড়িয়ে যায় তবে আরেকটি তাকে দংশন করে। (বোখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৯৭৫)

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন একবার নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কয়েকটি রেখা টানলেন এবং বললেন, এটা আশা আর এটা তার আয়ু। মানুষ যখন এ অবস্থার মাঝে থাকে হঠাৎ নিকটবর্তী রেখা (মৃত্যু) এসে যায়। (বোখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৯৭৬)

আল্লাহ বাণী : আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি যে, তখন কেউ নাসীহাত গ্রহণ করতে চাইলে নাসীহাত গ্রহণ করতে পারতে? আর তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল! (সুরা ফাতির, আয়াত-৩৭)

আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ যার আয়ু দীর্ঘ করেছেন, এমনকি তাকে ষাট বছরে পৌঁছে দিয়েছেন তার ওয়র পেশ করার সুযোগ রাখেননি।

ইব্নু আজলান মুকবেরী হতেও এরূপ বর্ণনা করেছেন। (বোখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৯৭৭)

আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, বৃদ্ধ লোকের অন্তর দু'টি ব্যাপারে সর্বদা যুবক থাকে। দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার ব্যাপারে আর দীর্ঘ আশার ব্যাপারে। আরেকটি হল উচ্চাকাঙ্ক্ষা। (বোখারী-৫৯৭৮) লায়স (রহঃ) সা'ঈদ ও আবু সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। [মুসলিম ১২/৩৮, হাঃ ১০৪৬, আহমাদ ১০৫১৯]।

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আদম সন্তানের বয়স বাড়ে আর তার সঙ্গে দু'টি জিনিসও বাড়ে; ধন-মালের প্রতি ভালবাসা আর দীর্ঘ বয়সের আশা। (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৯৭৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৯৭৯)

শুবাহ কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। [মুসলিম ১২/৩৮, হাঃ ১০৪৭, আহমাদ ১২১৪৩]

আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দীনার, দিরহাম, রেশমী চাদর, পশমী কাপড়ের দাসরা ধ্বংস হোক। ওদের এসব দেয়া হলে খুশি থাকে আর দেয়া না হলে নাখোশ হয়। (বোখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৯৯২)

আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল (দ.) যাহা বলিয়াছেন ইহা কি তাই? যদি তাই হয় মান্যকারীদের কারা কোথায়! কই সে ধার্মিকেরা! অথচ আল্লাহপাকের আহ্বান এই যে নিম্নে প্রদত্ত:

যে কেহ আল্লাহর রজ্জু সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল সে নিশ্চয়ই সরলপথ পাইল। (আল-ইমরান-১০১)

ব্যাখ্যা:-যারা আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিবে তারা সরলপথে হেদায়েতপ্রাপ্ত, অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনকে শক্তভাবে ধারণ করে তাঁর প্রতি নির্ভরশীল হওয়াই হল সর্বোত্তম পথ প্রদর্শন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

দ্বীনকে যে ধরল বা তার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করল, ও তার নির্দেশিত সম্মেলনস্থলে সমবেত হল। (তাফসীরে বায়যাবী)

উপরোক্ত আয়াতে কারীমা থেকে বুঝা গেল আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ করা মানেই আল্লাহর দিকে বন্দার গতি অর্থাৎ "ছায়েরে ইলাল্লাহ" আল্লাহর দিকে গমন করা/ প্রত্যাবর্তন করা ইত্যাদি।

আর যারা আল্লাহর পথকে গ্রহণ করে, তাদের কখনো সৃষ্টির দিকে ধাবিত থাকা, সৃষ্টি কামনা, সৃষ্টির প্রতি লোভ, সৃষ্টির প্রতি মোহ, থাকা চলে না। এসকল স্বভাব আল্লাহওয়ালাদের হতেই পারে না। তারা কখনো আল্লাহওয়ালারা হতেই পারে না যাদের মধ্যে এই স্বভাব পাওয়া যাবে।

পবিত্র কুরআনের সূরা ফুরকানে রাক্বুল আলামিন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করেন-

আপনি কি তাকে দেখেছেন? যে প্রবৃত্তিকে প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে! আপনি তাদের জন্য সুপারিশকারী /কর্মবিধায়ক হবেন? আপনি এই গণ্য করেন যে, তাদের অধিকাংশ নিশ্চয় গুনবে/জ্ঞানী হবে! নিশ্চয়ই তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত বরং তারা পথভ্রষ্ট। (সূরা ফুরকান ৪৩, ৪৪)

প্রবৃত্তিকে 'ইলা' প্রভুরূপে গ্রহণ করার ব্যাখ্যা:-

প্রবৃত্তি কি? তার পরিচয় জানা প্রথম প্রয়োজন। অভিধান মতে এর অর্থ নিযুক্ত হওয়া, স্পৃহা, অভিরুচি, প্রবণতা, ঝোঁক, সংসার জীবন। প্রবৃত্তির অর্থ যদি এই হয় তবে আল্লাহর বাণীতে আরো স্পষ্ট, যে এটাকে তারা প্রভুরূপে গ্রহণ করে। সাধারণত গ্রহণ করা আর না করা দুই কারণেই বেশী হয়। প্রেমের কারণে অথবা ভয়ের কারণে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেমের কারণটাই প্রাধান্য পায়।

গ্রহণ করা না করার ব্যাপারে আল্লাহপাক বলেন-

তারা আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াকে ভালোবেসে নেয়। (সূরা ইব্রাহীম-৩)

এখানে দুনিয়া শব্দটি প্রবৃত্তি নয় বরং এই দুনিয়ার সৃষ্টবস্তু সমস্তই বটে যাহা মরীচিকাবৎ, ক্ষণভঙ্গুর, ক্ষণস্থায়ী। এগুলো কখনো প্রভু হতে পারে না। মানুষ এগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এগুলোর স্রষ্টাকে ভুলে যায়। আর এই ভুলে যাওয়াকেই মূলত প্রবৃত্তিকে প্রভু রূপে গ্রহণ করা বুঝায়।

আল্লাহপাকের ইরশাদ-

মানুষের মধ্যে এমন মানুষ আছে যে আল্লাহ ছাড়া অপর কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ রূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালোবাসার অনুরূপ তাদেরকে ভালোবাসে কিন্তু যারা বিশ্বাসী আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় তারা সুদৃঢ়। (সূরা বাকারা-১৬৫) আর এ বিষয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- দুনিয়াতে এমন ভাবে থাকো যেন তুমি মুসাফির/ পথচারী এবং নিজেকে কবরের বাসিন্দা গণ্য করো। (বোখারী শরিফ)

মহা মনীষী বায়েজিদ বোস্তামী (র.) বলেন, কেউ কখনো আমার ওপর বিজয়ী হয়নি এই শহরে, এই ছেলেটির মত। সে হাজীদের পোশাক পরে আসলো আর জিজ্ঞেস করল, আপনার নিকট প্রবৃত্তি শব্দের অর্থ কি? বললাম, যখন পাইনা ধৈর্য ধারণ করি, আর পেলে খাই! উত্তর দিলো, এটা তো আমাদের বলক শহরের কুকুরদের অবস্থা!

আমি বললাম তাহলে তোমার দৃষ্টিতে "প্রবৃত্তি ত্যাগ" এর অর্থ কি? সে বললো, না পেলে শোকর করি আর পেলে অন্যকে দিয়ে দেই।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) বলেন, "টাকা-পয়সা দুনিয়া পূজার জন্য নয়, আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের জন্য মানুষের সৃষ্টি।"

"বিপুল সম্পদে নয়; ঈমানেই পুলসিরাত পার।"

রাসূলপাক (দ.) অন্য এক হাদীসে রয়েছে-

দুনিয়া ত্যাগ এবাদতের মূল আর দুনিয়াকে ভালোবাসা সকল গুনাহের মূল।

ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ার মায়া মোহ থেকে নিজেকে মুক্তরেখে রাক্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি কাম্য হাওয়াই একমাত্র আল্লাহর বান্দাগণের উচিত। আর যারা এটা করে অর্থাৎ এই তাজকিয়া অর্জন করে তারা তো শুধু নিজের জন্যই তা করে।

আল্লাহতায়াল্লা অপর আয়াতে বলেন

অর্থ যে কেউ নিজেকে সংশোধন করে, সে সংশোধন আপন কল্যাণের জন্যই করে থাকে। (সুরাফাতির-১৮)

অন্য আয়াতে রয়েছে

যে কেউ সংগ্রাম করে, সে তো নিজের জন্যই সংগ্রাম করে। (সূরা আনকাবুত-৬)

বুঝার বাকি রইল না এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের পথেই জীবন পরিচালিত করার মধ্যেই শান্তি নিহিত। আর এটাই একজন প্রকৃত আল্লাহর বান্দার স্বভাব।

এই স্বভাব তাদের মধ্যেই অর্জিত হবে যারা রাক্বুল আলামিনকে ভয় করে এবং বিশ্বাস করে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আমরা আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তনশীল। তাই আল্লাহ বলেন, যে নিজের রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে, সে নিজেকে নফস/ প্রবৃত্তি বা খারাপ কার্য থেকে বাঁচায়। (সূরা নাজিয়া ৪০) এই প্রবৃত্তি অনুরাগই মানুষকে বিভ্রান্তির পথে পরিচালিত করে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করে।

যারা বাঁচিয়ে রাখতে পারে নিজের নফসকে কু-প্রবৃত্তি থেকে তাদের জন্য পুরস্কারের ঘোষণা আল্লাহপাক কোরআনে এইভাবে দিচ্ছেন।

তাদের জন্য দু'টি জান্নাত, যারা আপন রবের সম্মুখে দাঁড়ানোকে ভয় করে। (সূরা আর রহমান-৪০)

আল্লামা জালালুদ্দিন রুমির বাণী-

আদম প্রবৃত্তির স্বাদ গ্রহণে যখন এক পা বাড়ালেন তখন এই প্রশস্ত দুনিয়া তার গলার হার হয়ে পড়ে।

বস্তুতঃ যারা এই প্রবৃত্তিকে প্রভুরূপে গ্রহণ করবে তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখা প্রবৃত্তির স্রষ্টার কর্তব্য নয় বরং তিনি বলেছেন যে, চুল পরিমাণ দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করবে তাকে তা দেওয়া হবে, আর যে আখেরাতের কল্যাণ কামনা করবে তাকে তাই দেওয়া হবে।

আল্লাহর বাণী

যে কেহ পার্থিব জীবন ও তার সাজ-সজ্জা/শোভা কামনা করে (দুনিয়ায়) আমি তাদের পূর্ণফল দান করি এবং এখানে তাদেরকে কম দেওয়া হবে না। (সূরা হুদ ১৫)

এই দুনিয়া কামনাকারী কখনোই এর স্রষ্টাকে কামনাকারী হতে পারে না। যদিও মুখে দাবি করে! যেমন রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

দুনিয়া অন্বেষণকারী আল্লাহ অন্বেষণকারী হতে পারে না। (সাবয়ে সানাবিল-১৯৬)

আর আল্লাহকে অন্বেষণের দাবি করলেও এই দাবিদাররা কেবল তালবাহানাকারি মাত্র। যেভাবে আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

আল্লাহর পথে বাধাদান করে এবং বক্রতা খুঁজে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে অনেক দূরে পড়ে আছে। (ইরহিম-৩)

তারা নিজেরা তো বা প্রবৃত্তিকে বা প্রভু বানিয়েছে অন্যকেও উৎসাহিত করে; ইহা আল্লাহর পথে বাধা দেওয়া নয় কি?

এ কাজ যারা করে তাদের কর্মফল তো এটাই দেওয়া হবে আল্লাহর সিদ্ধান্ত। নিম্নে-

এরাই হলো সেইসব লোক পরকালে যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নেই। (সূরা হুদ ১৬)

কারণ তারা প্রবৃত্তির বান্দা হয়ে অন্যদেরকেও তাদের সাথী করার অপচেষ্টাকারি এবং পরকালকে অবিশ্বাসী।

প্রমাণ হিসেবে আল্লাহপাকের অপর এক আয়াতে কারিমা দ্রষ্টব্য যারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় আর তাতে বক্রতা খুঁজে বেড়ায় এরা পরকালকে অস্বীকারকারী। (আল হুদ-১৯)

এই আয়াতে এটাই তো প্রমাণ করে। কারণ এরা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করেছে। নিম্নআয়াত তার প্রমাণ--

এরা সেই লোক যারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করেছে। (আল হুদ-২১)

নিশ্চয়ই পরকালে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আল হুদ- ২২)

যেহেতু তারা তালবাহানাকারী তাই তারা “কান খুইয়ে সেই ডাক শুনে না, চোখ খুইয়ে চোখে দেখে না” তাই কোরান তাদেরকে পশুর মত বলেছেন।

তাদের অন্তর আছে বিবেচনা করে না, চোখ আছে দেখে না, কান আছে শোনে না, তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত বরং আরও নিকৃষ্ট এরা অলস। (সূরা আরাফ -১৭৯)

তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত এবং আরও নিকৃষ্ট পথে। (আল ফুরকান-৪৪)

সুতরাং তাদের মত পথ ত্যাগ করে আল্লাহ ওয়ালাদের পথ অন্বেষণ করায় প্রকৃত আল্লাহর অন্বেষণকারীর কর্তব্য। যারা আল্লাহর রাসূলের পরে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে আদেশ নিষেধকারী। (চলবে)

সুফি উদ্ধৃতি

- এখনই তওবা কর, এটাই সময়, আগামীকাল তওবা করবে এ খেয়াল অনুচিত।
- আল্লাহুতায়াল্লা হতে সৎকাজের সাহায্য প্রার্থনা কর, নফস এবং খাহেশাতের পিছনে কখনও চলোনা।
- যে ব্যক্তি অপবিত্র নফসের পিছনে ঘুরতে থাকে সে কখনও আল্লাহর নূর এবং সৎ রাস্তা দেখতে পায় না।
- নফস এবং খাহেশাতের মাথায় তলোয়ার নিক্ষেপ কর, যে ব্যক্তি নফস এবং খাহেশাতের পিছনে ঘুরে সে দীনদার নয়।
- ফানায়ে নফস ব্যতীত নিষেধ কাজ থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই।
- নফসের বিনাশ এবং লতিফায়ে কুলবের শুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আত্মশুদ্ধি সংঘটিত হয়।
- খাহেশাতে নাফসানীর অনুগতদের নিকট হতে ঈমানের স্বাদ তালাশ করো না।
- (জাহেরী শয়তানী এলমের) শত শত কিতাব ও শত শত পাতা আগুনে নিক্ষেপ কর, নিজের মন ও প্রাণকে মাণিকের দিকে ধাবিত কর।
- তাকওয়া পূর্ণ পরহেজগারী এখতেয়ার কর, বেলায়ত ছাড়া পূর্ণ তাকওয়ার কোন সুরত নেই।
- প্রবৃত্তির বিনাশ এবং গুনাহ পরিত্যাগ করার নামই তাকওয়া বা পরহেজগারী।
- তাকওয়া বা পরহেজগারীর সাথে অতিরিক্ত নফল ইবাদতের কোন সম্পর্ক নেই।
- খুলুছিয়ত বা একাগ্রচিত্ত ব্যতীত ফরজ ওয়াজিব আদায় করলেও তাকওয়া বা পরহেজগারী অর্জন হবে না।
- আল্লাহকে ভয় কর, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করেছে সে সফলতা লাভ করেছে।
- ফাসেদ খেয়াল হতে অন্তরকে পবিত্র কর, আল্লাহ পাকের ইশকের মহাসমুদ্রে ডুব দাও।

---মুফতী-এ আযম, আল্লামা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রহ.)

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে উড্ডীয়মান স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা

॥ মোঃ মাহবুব উল আলম ॥

॥ ১ ॥

১৯৭১ সনের ৫ এপ্রিল, ২২ চৈত্র। হযরত গাউসুল আযম বিল বিরাসাত শাহসুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারীর (ক.) বার্ষিক উরস শরিফের দিন। ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ। পুড়ছে ঘর। পুড়ছে বাড়ি। সর্বত্র মানুষের হৃদয়বিদারক আহাজারী। ভয়-ভীতি-সন্ত্রাস সর্বত্র থাবা বিস্তার করে আছে ভয়ংকর এক কালো বিড়ালের মতো। এ অবস্থায় উরস শরিফ অনুষ্ঠান নিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়লেন ভক্ত-অনুসারীরা। তাঁরা গেলেন হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) কাছে।

তখন গ্রামাঞ্চলেও কার্ফু চলছে। অত্যন্ত ভয়াবহ এক অবস্থা। তিনি বললেন, ‘দেশের পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। আশেক-ভক্তরা যাতে মাগরিবের আগেই ঘরে ফিরতে পারেন, সেজন্যে আসরের নামাজের পরপরই তবারুবুক বিতরণ করা হবে। সবাই যেন সকাল সকাল আসেন’। ইতোমধ্যে তাঁর মুরিদ ফটিকছড়ির বক্তপুর নিবাসী মরহুম সৈয়দ নুরুল বক্তেয়ার শাহ্ (যিনি পরবর্তীকালে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) কুতুবে ইরশাদী হিসেবে পরিচিত হন) কীভাবে মাইজভাণ্ডার শরিফ আসবেন জানতে চাইলেন। হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) জানতে চাইলেন, তিনি (বক্তেয়ার শাহ্) কিভাবে আসতে চান। যুবক সৈয়দ নুরুল বক্তেয়ার শাহ্ বললেন, “বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে, ব্যান্ড বাজিয়ে গরু-মহিষ হাদিয়া সহ লোকজন নিয়ে মিছিল সহকারে চারদিক মুখরিত করে আসতে চাই”। হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) সম্মতি দিলেন। সৈয়দ নুরুল বক্তেয়ার শাহ্ অধীর আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে বললেন, “বাংলাদেশ কবুল হয়ে গেছে। যুদ্ধে বাঙালির জয় সুনিশ্চিত। অছিয়ে গাউসুল আযম যে পতাকা উড়াতে অনুমতি দিয়েছেন, আল্লাহর দরবারে তা অবশ্যই গৃহীত হয়েছে। এ পতাকা উড়তেই থাকবে”। (সূত্রঃ মরহুম বক্তেয়ার শাহ্ সাহেবের সাথে বর্তমান লেখকের বিভিন্ন সময়কালীন আলাপাচারিতা এবং মরহুমের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী পীরভাই জনাব জামাল আহমদ সিকদারের এতদসংক্রান্ত প্রবন্ধাবলী)। হ্যাঁ; ঐ দিন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়েই ঢোল-শোহরত সহকারে

মাইজভাণ্ডার শরিফে হযরত বাবা ভাণ্ডারীর উরস শরিফে এসেছিলেন সৈয়দ নুরুল বক্তেয়ার শাহ্ এবং তাঁর সহযোগী ভক্তবৃন্দ।

১৯৭১ সনের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে সারা বাংলাদেশ জুড়ে চলছিল হানাদার বাহিনীর হত্যা-ধ্বংস-অগ্নিসংযোগের পাশব যজ্ঞ। শহরে-বন্দরে হাটে-বাজারে স্কুলে-কলেজে-ঘরে-ঘরে উড্ডীন বাংলাদেশের পতাকা সমূহ পোড়ানোর উৎসব চালাচ্ছিল তারা। এ সময় ৩ এপ্রিল থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে হানাদার বাহিনী বিপুল সৈন্য-সামন্ত ভয়ংকর অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছিল টাঙ্গাইলের সন্তোষে মওলানা ভাসানীর জীর্ণ কুটিরে। স্ট্রেচার বুলেট দিয়ে তারা জ্বালিয়ে দিয়েছিল তাঁর সন্তোষের কুঁড়েঘর। পুড়ে গিয়েছিল সেখানে উড্ডীন বাংলাদেশের পতাকা।.....

.....আর ঐ ৫ এপ্রিল মাইজভাণ্ডার শরিফে প্রকাশ্য দিবালোকে হানাদারদের সশস্ত্র হিংস্র ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে মহাগৌরবে উড়ছিল স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের নয়া উত্থানের দ্যোতক পতাকাটি।

॥ ২ ॥

মুক্তিযুদ্ধ

শুরু হল মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যে কোন মানদণ্ডের বিচারে একটা ব্যাপক জনযুদ্ধ। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনা থেকেই মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ হয়ে উঠে মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র। উত্তর চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি হয়ে যে সব মুক্তিযোদ্ধার যাতায়াত ছিল, তাঁরা মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ জিয়ারত করে, তাঁদের দোয়া কামনা করে দেশমাতৃকার মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। ব্রহ্মছড়ি হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন অরণ্য দিয়ে যাদের যাতায়াত ছিল, তাঁরাও মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে সালাম আরজ করে যেতেন এবং চাইতেন দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য দোয়া। এখানে অনেক মুক্তিযোদ্ধা প্রয়োজনবোধে আত্মগোপন করে থেকেছেন এবং এ অবস্থায় পেয়েছেন আহাৰ্য, আশ্রয় ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা। এখানে আত্মগোপন থাকা অবস্থায় গেরিলা যোদ্ধারা বিভিন্ন পয়েন্ট ও শেলটারের সাথে নিশ্চিন্তে যোগাযোগ চালিয়ে গিয়েছিলেন। মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের

বদৌলতে চট্টগ্রামসহ সারাদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা মাইজভাণ্ডারী ভক্তদের প্রতিটা গৃহও হয়ে উঠেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের শেল্টার, ঘাঁটি, ডেন। প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধা এসব গৃহে অর্থাৎ গেরিলা যুদ্ধের পরিভাষায় শেল্টার, ঘাঁটি কিম্বা ডেনে পেয়েছেন গৃহকর্তা-কর্ত্রীদের কাছ থেকে সন্তানের মতো স্নেহ-মমতা-নিরাপত্তা। পেয়েছেন ভাই-বোনের আদর-যত্ন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রাম শুরু থেকেই রূপ পরিগ্রহ করেছিল জনযুদ্ধের। বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের আন্তরিক ও নির্ভীক শরিকানায় পরিচালিত হয়েছিল আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ফ্রন্টে সক্রিয় সৈনিক হিসেবে আমাদের দরিদ্র গ্রাম-বাংলাদেশের নারী-পুরুষ-মা-বোন-কিশোর-তরুণ-চাষা-মজুর-কুলি-শ্রমিক-ফকির-মিসকিন-ভিখারী এমনকি কোথাও কোথাও চোর-চাট্টা তথা সর্বস্তরের মানুষের এই অংশগ্রহণের যথাযথ ঐতিহাসিক মূল্যায়ন আজো হয়নি। জনযুদ্ধ বা Peoples' War বলতে যা বুঝায়, ১৯৭১ সালে আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমরা এদিকে দেশের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

॥ ৩ ॥

ময়ূরখিল ট্রানজিট ক্যাম্প

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ থেকে ১০/২০ মাইল উত্তর-পূর্বে ময়ূরখিল গ্রাম। সেখানে একটা খামার। সেই খামারের স্বত্বাধিকারী মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের গাউসিয়া আহমদিয়া মন্জিলের শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)। এই ময়ূরখিল খামার গোড়া থেকেই হয়ে উঠে মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ ট্রানজিট ক্যাম্প। মুক্তিযোদ্ধারা এখান থেকে এদিক-ওদিকে গিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন করতেন। এই খামারে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধাদের চাল সরবরাহ হতো খামারের গোলা থেকে। পুকুরের মাছ, বাগানের শাকসব্জি, এমনকি গরু-ছাগল, মোরগ-মুরগী সবই ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নিবেদিত।

যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক কুলাঙ্গার লোভের বশবর্তী হয়ে হানাদার বাহিনীর গুপ্তচরগিরি করতো, তাদের মাধ্যমে একদিন এই ময়ূরখিল খামারের খবর পৌঁছে যায় হানাদারদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে। একদিন হানাদার সেনারা এসে হানা দেয় এই খামার তথা মুক্তিযুদ্ধের ট্রানজিট ক্যাম্প। এ সময় খামারের দায়িত্বে ছিলেন ৭০ বছর বয়সী বৃদ্ধ ভক্ত (মরহুম) ওমর আলী ফকির। হানাদারদের আগমন সংবাদ আগে-ভাগেই পৌঁছে যায় খামারে। মুক্তিযোদ্ধারা সরে পড়েন

নিরাপদে। সরে যান অন্যান্য কর্মচারীরা। এমনকি আশে-পাশের খামারের লোকজনও। হানাদার সেনারা সেখানে গিয়ে পান ওমর আলী ফকিরকে। সত্তর বছরের সৌম্য বৃদ্ধ ওমর আলী ফকিরকে তারা চাপ দিতে থাকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে খবরা-খবর দেবার জন্য। ওমর আলী ফকির তাদের সাথে উর্দুতে কথাবার্তা বলছিলেন। তিনি ভালো উর্দু বলতে পারতেন। তাঁর মুখে উর্দু ভাষা শুনে হানাদার সেনারা ঈষৎ চমকিত হয় বৈকি। এভাবে উর্দু বলতে কোথা থেকে শিখলেন জানতে চাইলে তিনি বললেন, এক সময়ে বৃটিশ নৌ বাহিনীতে ছিলাম।

হানাদার সেনারা জানতে চায়, এখানে যে সব 'মুক্তি' ছিল, তারা কোথায়? তিনি অনেক তাল-বাহানার পর দক্ষিণ দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করে বলেন, ওদিকে যেতে পারে। হানাদার সেনারা বলে, তোমরা মুক্তিদের খাদ্য ও আশ্রয় দাও। তোমাকে এখন গুলি করে মারা হলে ওরা কি তোমাকে বাঁচাতে আসবে? জবাবে বললেন, ওরা বাঁচাবে কেন? আমি তো আমার পীর-বাবার অর্পিত দায়িত্ব পালন করছি মাত্র। বাঁচা-মরার জন্য করি না। আর দুনিয়ায় তো কেউ চিরদিন বেঁচে থাকে না।

হানাদার সেনারা জানতে চায় ঐ পীর বাবার পরিচয়। জবাবে তিনি বলেন, পীর বাবা হলেন হযরত শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)। তিনি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) নাতি।

হানাদাররা কোথায় যেন একটু হাঁচট খায়। আরো কিছু কথাবার্তার পর হানাদাররা তাঁকে নিয়ে ধুরং খালের দিকে যেতে থাকে। তাঁকে সাথে রেখে নদী পার হয়। খাল পার হয়ে বেশ কিছু দূর গিয়ে তাঁকে তারা ছেড়ে দেয়। তিনি খামারের দিকে চলে আসতে থাকেন।

ইতোমধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা পজিশন নিয়ে বসে গেছেন। ওমর আলী ফকির বলেন, কিছুক্ষণ পর গোলাগুলির প্রচণ্ড আওয়াজ শুনি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বাঁপিয়ে পড়ে হানাদার সেনাদের উপর। পরে শুনেছিলাম, উভয় পক্ষে কয়েকজন হতাহত হয়েছিল।

এরপর থেকে হানাদাররা ঐ এলাকা এড়িয়ে চলতো। ময়ূরখিল হয়ে উঠে মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ ঘাঁটি ও ট্রানজিট ক্যাম্প।

(বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ - গ্রন্থ হতে সংকলিত)

তাওহীদের সূর্য: মাইজভাণ্ডার শরিফ ও বেলায়তে মোত্লাকার উৎস সন্ধান

॥ জাবেদ বিন আলম ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বেলায়তে মোত্লাকা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করার লক্ষ্যে ইতোপূর্বে অনেক আউলিয়া, আল্লাহ্ প্রেমিক শায়ের এর মূল বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তাঁদের চিন্তা-চেতনা এবং আত্মিক ধ্যান-ধারণায় একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে— তা হচ্ছে তাওহীদ। তাঁদের অনুভূতি-অনুধ্যানে বিকাশমান হয়েছে, আল্লাহ্ ব্যতীত সমগ্র সৃষ্টি নিষ্প্রাণ। ‘রুহ’ আল্লাহ্র পরম মমতা এবং মহা পরাক্রম শক্তিসম্পন্ন নির্দেশ। ‘রুহ’ ব্যতীত কোন সৃষ্টিরই অস্তিত্ব নেই। সৃষ্টির মধ্যে যতোক্ষণ ‘রুহ’ অস্তিত্বশীল ততোক্ষণ পর্যন্ত সকল সৃষ্টি সপ্রাণ। এ জন্যে সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্র মহিমা বন্দনায় সদা ব্যস্ত। সবকিছুই আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তিতে শক্তিমান। মানুষের চিন্তা-চেতনা-কর্ম-ভাবনা, রাগ-বিরাগ, শক্তি প্রদর্শন সবকিছুর মূলে রয়েছে ‘রুহের’ অবস্থান। ‘রুহ’ নির্গত হওয়ামাত্র বিশাল দেহের পালোয়ান, বর্বর জালিম ফেরাউন-নমরুদ সবই অকেজো, অপদার্থ। তাই তো আল্লাহ্ যখনই ইচ্ছা করেন সুউচ্চ পাহাড়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করেন, পর্বতে আগ্নেয়গিরি সঞ্চারণ করে অগ্নি উৎপাত ঘটিয়ে বিরান এলাকা সৃষ্টি করেন। সমুদ্রকে উত্তাল করে জনপদ ধ্বংস করেন, ভূমিকম্পের মাধ্যমে ভূমিধস ঘটান। তাই সুবহে সাদেকের সুশীতল বায়ু প্রবাহে, পানির কলরবে, জলতরঙ্গে হিমেল হাওয়ায়, গাছের পাতার ঝির ঝির শব্দে, পাখির সুমিষ্ট গানে যেমন-আল্লাহ্র জিকিরের স্নিগ্ধতা ভেসে আসে, তেমনি আশুনের লেলিহান শিখা, সূর্যের খরতাপ, ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব, মেঘের গর্জন, মহাপ্লাবন, কঠিন বজ্রপাতের মতো ধ্বংসলীলার মূলেও রয়েছে অসীম শক্তিদর আল্লাহ্র পরাক্রম। এ ধরনের মহামহিমের অনন্ত দয়া এবং প্রয়োজনে নির্মম মহাপরাক্রম শক্তি কেন্দ্র হলেন আল্লাহ্। তাওহীদের মর্মচেতনায় নবী-রাসূল-অলি-দরবেশ-কলন্দর, মস্তান-ভাব-বিভোর আউলিয়া, মজজুব সাধকরা একাত্ম হয়ে সবকিছুতে দৃঢ় চিত্তে আল্লাহ্র অস্তিত্বের ঘোষণা দিয়ে থাকেন— যাতে মানুষ আল্লাহ্র অনুবর্তী হয়ে কালাতিপাত করেন।

তাওহীদের এ ধরনের মর্মচেতনার অন্যতম কীর্তিমান মহাপুরুষ হলেন হযরত আবু সাঈদ আবুল খায়ের (রহ.)। বুহত্তর খোরাসানের মাইন গ্রামে ৭ ডিসেম্বর, ৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম। ১২ জানুয়ারি ১০৪৯ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত নিশাপুর শহরে তাঁর ইন্তিকাল এবং সেখানেই তিনি সমাহিত হন। ইন্তিকালের ১৩০ বছর পর তাঁর পৌত্র মুহাম্মদ ইবনে মনওয়ার

“আসরার আল্ তাওহীদ (একত্বাদের রহস্য)” গ্রন্থ লিখে হযরত আবু সাঈদ আবুল খায়ের সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে জ্ঞাত করেন। হযরত আবু সাঈদ আবুল খায়ের পারস্যের একজন বিখ্যাত সুফি এবং মরমী কবি, যিনি সুফি ধারা এবং ঐতিহ্যের বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। জীবদ্দশায় তাঁর সুখ্যাতি স্পেনসহ ইসলামী বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তিনিই প্রথম সুফিবাদী লেখক যিনি সপ্রতিভায় ভালবাসার সাধারণ কবিতাকেও ঐশী প্রেমের নির্যাসে রাঙিয়ে তুলেছেন।

হযরত আবু সাঈদ আবুল খায়ের (রহ.) তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, ইসলামী গূঢ়তত্ত্ব এবং আরবী সাহিত্যের উপর সম্পন্ন করেন। তেইশ বছর বয়সে তিনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রম পরিত্যাগ করে সুফিবাদে মনোনিবেশ করেন। এ সময় তিনি তাসাওউফ সম্পর্কিত কিতাবাদি অধ্যয়নে এতো বেশি মনোযোগী হন যে তিনি তাঁর পিতার নিকট একটি পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানান। পিতা আবুল খায়ের ছিলেন গজনী শহরের হারবাল ব্যবসায়ী। এক পর্যায়ে তিনি সুলতান মাহমুদ গজনীর দরবারে মুসাহেবের শ্রেণিভুক্ত হন। পৃথক গৃহে অবস্থানকালে হযরত আবু সাঈদ বিভিন্ন আউলিয়ায় কেরাম রচিত কিতাবসমূহ হতে মূল্যবান কথা ও উপদেশগুলো কাগজে লিখে ঘরের দেয়ালে টানিয়ে রাখেন। একই সঙ্গে পবিত্র কোরআনের বহু আয়াত বেছে বেছে লিখে দেয়ালে ঝুলিয়ে দেন। একদিন ঘটনাক্রমে তাঁর পিতা পুত্রগৃহে প্রবেশ করে ঘরের দেয়ালের অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি কেন পবিত্র কুরআনের এ সমস্ত আয়াত এবং বাণী দেয়ালে টানিয়ে রেখেছ। জবাবে হযরত আবু সাঈদ আবুল খায়ের বলেন, “আপনি আপনার ঘরের মধ্যে বাদশাহ্ এবং অন্যান্য বড় বড় আমীর-ওমরার ছবি টানিয়ে রেখে তাঁদের প্রতি আকর্ষণ ও মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। আর আমি কুরআন পাকের আয়াতসমূহ ও এ সকল বাণীকে প্রাণ দিয়ে মহব্বত করি, এ জন্যে আমার গৃহে লাগিয়ে রেখেছি। হয়তো এ মহব্বতের বরকতে একদিন মাহবুব আমার প্রতি প্রসন্ন এবং মেহেরবান হবেন।” পুত্রের জবাবে পিতার মন এতো বেশি প্রভাবিত হয় যে, তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে সমস্ত ছবি নামিয়ে ফেলেন। একই সঙ্গে তিনি পুত্রকে অধিকতর শিক্ষা অর্জনের জন্যে “মরো” শহরে পাঠিয়ে দেন। হযরত আবু সাঈদ আবুল খায়ের জাহেরী শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি বাতেনী শিক্ষা অর্জনের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। বাতেনী এলম

হাসিলের লক্ষ্যে তিনি তখনকার সময়ের প্রখ্যাত শায়খ হযরত শেখ আবুল ফজল সাব্বাসী (রহ.)-এর সংসর্গে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন। এ সম্পর্কে হযরত আবু সাঈদ আবুল খায়ের উল্লেখ করেন, “একদিন আমি কোথাও যাচ্ছিলাম। দেখলাম সাব্বাস নগরীর উপকণ্ঠে এক জায়গায় একটি ভিক্ষুপের উপর লোকমান মজনুন (মযযুব) বসে রয়েছেন। আমিও তথায় উঠলাম। তিনি নিজের পেস্তানী সেলাই করছেন। আমি তাঁকে দেখতে লাগলাম। তাঁর পেস্তানীর উপর আমার শরীরের ছায়া পড়েছিল। তাঁর সেলাইয়ের কাজ শেষ হলে তিনি বললেন, সাঈদ! আমার পেস্তানীর সঙ্গে তোমাকে সেলাই করে যুক্ত করে দিলাম। এ বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত ধরে আমার পীর আবুল ফজল সাব্বাসীর (রহ.) খানকায় নিয়ে যান। সেখানে পৌঁছে লোকমান মজনুন (রহ.) আওয়াজ দিলে হযরত সাব্বাসী (রহ.) বের হয়ে আসেন। তখন লোকমান মজনুন (রহ.) তাঁকে বলেন, হে আবুল ফজল! এ লোকটিকে তোমার কাছে রাখ, এ লোকটি তোমার। এ বলে তিনি আমার হাত ছেড়ে দেন। হযরত আবুল ফজল (রহ.) আমার হাত ধরে তাঁর খানকাহ এর ভিতরে নিয়ে যান। অতঃপর পীর সাহেব কিতাবের একটি খণ্ড নিয়ে বারান্দায় বসে পাঠ করতে থাকেন। আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম এ কিতাবটির মধ্যে এমন কি বিষয় লিখা আছে যে, হযরত শায়খ খুব মনোযোগের সঙ্গে এটি পাঠ করছেন। হযরত আবুল ফজল (রহ.) কাশ্ফের দ্বারা আমার মনের প্রশ্ন জানতে পেরে বলেন, “আবু সাঈদ! আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর শুধু এ জন্য প্রেরণ করেছেন যে, তাঁরা লোকের কাছে প্রচার করবেন যে, সকলের মা'বুদ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। তারা সকলে এ পয়গাম নিয়ে আগমন করেন। যারা মনেপ্রাণে এ কলেমায়ে তাইয়েবা গ্রহণ করেছেন, তারা এর মধ্যে নিমগ্ন হয়ে গেছেন।” হযরত আবু সাঈদ উল্লেখ করেন, “এ রাতে তাঁর বিন্দুমাত্র ঘুম হয় নি।”

একদিন শায়খ আবু সাঈদ (রহ.) বাইরে বসে আছেন। তখন গাছের পাতাগুলো হলদে বর্ণের দেখাচ্ছিল। এটি দেখে তিনি বলেন, “হে বৃক্ষ, তুমি সূর্য কিরণের তাপে হলদে হয়েছ, আর আমি এশকের আগুনের তাপে হলদে হয়েছি। তুমি চন্দ্র সূর্যের অধীন আর আমি মাণ্ডকের মহক্বতের অধীন।”

একবার একলোক এসে তাঁকে বলেন, “অমুক ব্যক্তি পানির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে।” জবাবে তিনি উল্লেখ করেন, “হাঁস-মোরগ যখন পানির উপর দিয়ে চলতে পারে তখন এটি কোন কঠিন কাজ নয়।” লোকটি আবার বলেন, “অমুক ব্যক্তি বাতাসের উপর দিয়ে উড়তে পারে।” তিনি বলেন, এটি কোন কঠিন কাজ নয়, কেন না, কাক এবং মাছিও তো হাওয়ার উপর উড়তে পারে। লোকটি পুনরায় বলেন, “অমুক ব্যক্তি এক

নিমিষের মধ্যে এক শহর হতে অন্য শহরে চলে যেতে পারে।” উত্তরে হযরত আবু সাঈদ (রহ.) জানান, “শয়তানও এক মুহূর্তে মশরেক হতে মাগরেবে চলে যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, এ সমস্ত বিষয়ের কোনই মর্যাদা এবং মূল্য নাই। সত্যিকারের আল্লাহুওয়লা লোক তিনিই, যিনি লোক সমাজে উঠাবসা করেন, লোকের সঙ্গে লেন-দেন করেন, আমোদ-আহলাদও করেন, কিন্তু এক নিমিষের জন্য আল্লাহ তা'আলার স্মরণ হতে গাফেল হন না। কেউ তাকে তাসাওউফের অর্থ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, অন্তরে গোপন রহস্য যা কিছু লাভ করেছ, গোপন রাখবে। হাতে যা আছে দান করবে, আর বিপদ-মুছিবত যা কিছু আসে, তা হতে সরে যাবে না; বরং ধৈর্যের সঙ্গে বরদাশ্ত করবে।” মনে রাখবে আল্লাহুতালাই তোমার একমাত্র অবলম্বন তিনি ছাড়া সবকিছু নিছক কামনা-বাসনা মাত্র। আর নফস হতে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্যুত হওয়া কর্তব্য।” এ প্রসঙ্গে তিনি মহানবী (দ.) এর বাণী উল্লেখ করেন, “ইলাহী! আমাকে চক্ষুর পলক পাতের সময়ের জন্যও এমন কি, এর চেয়ে কম সময়ের জন্য আমার নফসের হাতে সমর্পণ করবেন না। অর্থাৎ, এক নিমিষের জন্যও আমার রক্ষণাবেক্ষণ ত্যাগ করবেন না।” হযরত আবু সাঈদ (রহ.) উল্লেখ করেন, “বান্দা এবং আল্লাহ তা'আলার মধ্যখানে আসমান-জমিন কোন পর্দা নহে, আরশ-কুরসিও কোন পর্দা নহে, বরং বান্দার তাকাব্বুর এবং অহঙ্কারই তার জন্য আল্লাহুতা'আলার পথে বিরাট পর্দা। এ পর্দা বা বাধা মাঝখান থেকে উঠে গেলে মানুষ নিজেই আল্লাহুতা'আলা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।”

হযরত আবু সাঈদ (রহ.) এর প্রধান শিক্ষা হচ্ছে ‘আমিত্ব’ থেকে মুক্তি। অহংবোধ বা আমিত্বের কারণে আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা ঘটে। এ কারণে তিনি কোন সময় ‘আমি’ বা আমার শব্দ উল্লেখ করতেন না, বরং বলতেন ‘সে’ বা ‘তারা’। এটি তাঁর বন্দেগীর এবং পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের একটি নিয়মিত সবক।

তাঁর সঙ্গে প্রখ্যাত দার্শনিক চিকিৎসক হযরত আবু সিনা তথা ইবনে সিনার গভীর যোগাযোগ ছিল। তাঁরা পরস্পরকে গভীর শ্রদ্ধা এবং সম্মান করতেন। একবার একাদিক্রমে তিন দিনের একান্ত আলাপনের পর ভক্তদের প্রতি তাঁদের পারস্পরিক মতামত ছিল এরূপ, ইবনে সিনার মতে তিনি যা জানেন, আবু সাঈদ তা দেখেন। তিনি একজন মস্ত বড় আউলিয়া, যাকে আল্লাহ অসীম ক্ষমতা প্রদান করেছেন।” আর আবু সাঈদ (রহ.) এর মতে “ইবসে সিনা জানেন।”

হযরত আবু সাঈদ (রহ.) প্রাথমিক সময়ের বিশিষ্ট সুফি হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.) এবং হযরত মনসুর হাল্লাজের (রহ.) প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান পোষণ করতেন। প্রায়শঃ তিনি হযরত বায়েজীদ বোস্তামীর (রহ.) রওজায় গমন

করতেন। ‘আসরারে তাওহীদ’, ‘তায়কেরাতুল আউলিয়া’ এবং ‘নূরুর উলুম’ গ্রন্থ থেকে জানা যায় হযরত আবু সাঈদ (রহ.) এক সময় হযরত শায়খ আবুল হাসান খেরকানী (রহ.) সমীপে গমন করেন এবং সেখানে রাতে অবস্থানকালে তাঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিক হালের বিনিময় হয়। তিনি হযরত আবুল হাসান খেরকানীর ব্যক্তিত্ব ও আদর্শে বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। হযরত আবুল হাসান খেরকানী (রহ.) সমীপে যে দিন স্বীয় শিষ্যবৃন্দসহ হযরত আবু সাঈদ আবুল খায়ের (রহ.) গমন করেন, সেদিন হযরত খেরকানী (রহ.) এর গৃহে মেহমান নাওয়াজী করার মতো কোন প্রকার খাবার ছিল না। এমতাবস্থায় হযরত আবুল হাসান খেরকানী (রহ.) স্বীয় খাদেমকে মেহমানদের জন্য দস্তুরখানা বিছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। এরপর একখানা বিছানার চাদর দেখিয়ে বলেন, “এর নীচে বারে বারে হাত ঢুকিয়ে রুটি নিয়ে মেহমানদেরকে দেবে। তবে খুবই সাবধান চাদর তুলে ফেলে একই সাথে সবরুটি নেবার চেষ্টা করবে না।”

তৃপ্তি সহকারে মেহমানদের আপ্যায়ন শেষে হযরত আবু সাঈদ আবুল খায়ের (রহ.) সামা মাহফিল আয়োজনের প্রস্তাব করেন। হযরত আবুল হাসান খেরকানী (রহ.) স্বয়ং সামার প্রতি তেমন পায়বন্দ ছিলেন না। কিন্তু মেহমানদের সন্তুষ্টি এবং সম্মানার্থে সামার নির্দেশ দেন। কাওয়াল গজল শুরু করার কিছুক্ষণ পর হযরত আবু সাঈদ বলেন, এখন দাঁড়াবার সময় হয়ে গেছে। তখন হযরত আবুল হাসান (রহ.) দাঁড়িয়ে যমিনের উপর তিনবার এমন জোরে পদাঘাত করেন, এতে খানকার দেয়াল পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। তখন হযরত আবু সাঈদ (রহ.) বলেন, “সামা হয়ে গেছে, আর দরকার নেই। কাওয়াল! বন্ধ কর, নতুবা গৃহটি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।”

হযরত আবু সাঈদ (রহ.) তখন মাহফিলকে লক্ষ্য করে বলেন, “হযরত আবুল হাসান (রহ.) এর হাল এসে গেছে। আসমান-জমিন তাঁর সাথে মিলিত হয়েছে।” জবাবে হযরত আবুল হাসান (রহ.) বলেন, “সামা শুধু এমন লোকের জন্যে জায়েয, যাঁর দৃষ্টির সম্মুখে আসমান থেকে আরশ পর্যন্ত এবং ভূতল থেকে পাতাল পর্যন্ত ভেসে উঠে এবং তাঁর দৃষ্টির সম্মুখ থেকে সমস্ত যবনিকা দূর হয়ে যায়। এরপর তিনি মাহফিলে সমবেত লোকজনের উদ্দেশ্যে বলেন, “তোমাদের কাছে যদি কোন পক্ষ জিজ্ঞেস করে যে, তোমরা সামার সময় এভাবে নৃত্য করো কেন? তখন তোমরা সহজ-সরল জবাব দিবে এবং বলবে, “অতীত বৃজুর্গদের অনুসরণ করে চলেছি মাত্র।”

এক পর্যায়ে হযরত আবুল হাসান খেরকানী (রহ.) এবং হযরত আবু সাঈদ (রহ.) দু’জনের হাল-অবস্থা একে অপরের মধ্যে অদল-বদল করে নেয়ার জন্যে একমত হন। পারস্পরিক মতৈক্যের ভিত্তিতে তাঁরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হন এবং খেরকা অদল-বদল করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের হাল-অবস্থার পরিবর্তন

ঘটে। হযরত আবু সাঈদ (রহ.) গৃহে প্রত্যাভর্তন করে সারারাত দুজানুর উপর মস্তক রেখে কান্নাকাটি করে কাটান। অন্যদিকে হযরত আবুল হাসান (রহ.) হালের আবেশে সারারাত চীৎকার করে সময় অতিবাহিত করেন। সকালে হযরত আবু সাঈদ আবুল খায়ের (রহ.) হযরত আবুল হাসান খেরকানীকে (রহ.) বলেন, আপনি আমার খেরকা আমাকে ফেরত দিন, আমার মধ্যে এতো পেরেশানী ও চিন্তা-ভাবনা সহ্য করার সামর্থ্য নেই।” তখন হযরত আবুল হাসান (রহ.) বিসমিল্লাহ বলে পুনরায় হযরত আবু সাঈদের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। এর ফলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নিজেদের হাল জজবা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে।

হযরত আবু সাঈদ আবুল খায়ের ছিলেন অসামান্য প্রতিভার অন্তর্গত দৃষ্টিসম্পন্ন কবি। তাঁর রচিত গজল সমূহে আল্লাহর দরবারে বার বার ফরিয়াদ এসেছে (ক) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর রূপ ও সৌন্দর্য দর্শনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। (খ) রোজ কিয়ামতের দিন অবর্ণনীয় তিরস্কারের মুখে শাফায়াতের নবী মুহাম্মদ (দ.) এর বাগানে উঠানোর ফরিয়াদ। (গ) কবরের চাদর খুলে উদ্ভিদ অংকুরের উদ্গমের মতো গজিয়ে উঠার কালে মহানবী (দ.) এর বাগানে আশ্রয় দানের ফরিয়াদ। তাঁর কবিতায় ছন্দ মিলিয়ে তিনি তাসাওউফ-মারেফাতের বর্ণনা এনেছেন এভাবে, (১) চিকিৎসকের নিকট গিয়ে আমার অন্তরের গুপ্ত বেদনার কথা জানালাম। চিকিৎসক বললেন, দোস্ত ব্যতীত অন্যান্য সকল হতে জবান বন্ধ করে ফেল। (২) জিজ্ঞেস করলাম পথ্য কি? তিনি বললেন, কলিজার রক্ত (খুনে জিগর)। (৩) কোন বস্তু হতে পৃথক হতে হবে? বললেন, উভয় জগত হতে। (খ) যে ব্যক্তি আপনাকে (নিজেকে) চিনতে পেরেছে সে নিজকে ভুলে গেছে। (গ) এলাহী! আমার দিলের সমুদয় আকাঙ্ক্ষা আপনি। আমার দিলের সমুদয় লাভের মূলধন আপনি। যতোই দুনিয়া ও যমানার মধ্যে নজর দৌড়িয়ে দেখলাম, আজও সব আপনি, কালও সব আপনি। (ঘ) এশকের পাগল পাহাড় ও ময়দানের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। এশকের পাগল আগা-মাথাও চিনে না। যে ব্যক্তি আপনার দিকে পথ পেয়েছে, সে নিজকে হারিয়ে ফেলেছে।

হযরত আবুল হাসান খেরকানী (রহ.) এবং হযরত আবু সাঈদ আবুল খায়ের (রহ.) এর ঘটনার আলোকে তাসাওউফ জগতের যে বহুরূপ এবং বহুমুখি ধারা সম্পর্কে ধারণা উন্মোচিত হয়েছে—এর মধ্যে বেলায়তে মোতলাকা তথা আল্লাহর সঙ্গে বান্দার উন্মুক্ত প্রেমতত্ত্ব স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়।

দিল্লীরাজ শায়খুল আউলিয়া, কুতুবুল আকতাব হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখতেয়ার কাকী (রহ.)

ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার এবং তাওহীদের ডাক দিতে যিনি প্রথম আসেন তিনি হলেন সুলতানুল হিন্দ, আতায়ে রাসুল, গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশ্‌তি (ক.)। তাঁর প্রধান খলিফা এবং শিষ্য হলেন কুতুবুল আকতাব হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রহ.)। তাসাওউফ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী প্রাথমিক যুগের অনেক সুফি বিশেষতঃ হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহ.), মনসুর হাল্লাজ, ওমর ইবনুল ফরিদ, আবু সাঈদ আবুল খায়ের (রহ.) প্রমুখের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ দেখা যায়। অবশ্য তাঁর মুর্শিদ খাজা গরীবে নেওয়াজও অত্যন্ত উচ্চাঙ্গ সুরে একই ধারার কথা বলেছেন। যেমন সুলতানুল হিন্দ বলেছেন, “অহর্নিশ সে আমার সাথে, আমি বোকামি করে তাকে তালাশ করি, মুশকিল হলো, কখনো আমি মিলনে কখনো বিচ্ছেদে।” “মানব দেহে যদি আল্লাহর হাত না-ই থাকতো, পানি ও মাটির মানুষকে কিভাবে ফিরিশতারা সিজদা করলো।” আর তাঁর প্রধান শিষ্য খাজা কুতুবুদ্দিন (রহ.) বলেন, “হে কুতুবুদ্দিন, যদি তোমাকে কেউ রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, বলো, এটা খোদার আদেশ নয়, ‘রুহর খোদা’। তিনি আরো উল্লেখ করেন, “মাটির তৈরি আদমের দরগায় ফিরিশতারা সিজদাবনত হয়েছে শুধু মাত্র রুহর কারণে।” কুতুবুল আকতাব (রহ.) বলেন, “ওহে ক্রটি-সন্ধানী, আশেকদেরকে ঈমান ও কুফর বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না, যে আশেক হয়েছে সে কুফর ও ঈমানের গন্ডির বাইরে চলে গেছে।”

অন্যত্র তিনি বলেছেন, “এশ্‌ককে প্রশ্ন করলাম, ‘হকতায়লা কোথায়; বললো, যেখানেই তুমি তালাশ কর-হোক সেটা মসজিদ আর গীর্জা-তিনি আছেন।’ হযরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রহ.) এর উপর্যুক্ত বক্তব্যসমূহ মূলতঃ ওয়াহ্দাতুল অজুদ ধারণার পক্ষে বলিষ্ঠ এবং একনিষ্ঠ উচ্চারণ। আল্লাহর প্রতি পরম নিবেদনে সবকিছুর প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ করে প্রেম শুধু আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত এ ধরনের একাত্মতায় যখন অলি-দরবেশ-সাধক ছিন্ন বস্ত্রধারী মজজুব প্রেমশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ইবাদতে মশগুল হন তখন তাঁরা বেহেশত, দোজখ, হুর-গেলমান এসবের তোয়াক্কা করেন না। তাঁরা শুধু মাশুককে চান। মাশুকের সঙ্গে মিলনের আনন্দ উপভোগ করতে চান। ইহকাল-পরকাল নিয়েও তাঁরা মাথা ঘামান না। তাঁরা মুহূর্তেই মাশুকের রাহে নিজকে কোরবানী দিতে প্রস্তুত থাকেন। এ নিয়ে তাঁদের বিন্দু পরিমাণ ভয়-ভীতি-শংকা থাকে না, থাকে না কোন প্রকার পিছুটান। তাঁরা ঐশী প্রেম শরাব পান করে এতো উন্মত্ত হয়ে যান যে, তাঁদের স্বাভাবিক হুঁশ-জ্ঞান অনেক সময় লুপ্ত হয়ে যায়। হযরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী সিলসিলার ঐতিহ্য অনুযায়ী কোন কোন সময় কাজী হামিদুদ্দিন নাগরীর খানকায় গমনপূর্বক কাউয়ালী শুনতেন। একবার কাউয়ালীর মজলিসে জনৈক

কাউয়াল উচ্চারণ করেন, “সুরুদ চীন্ত কে চান্দী ফোসনে এশ্‌ক দরুস্ত। সুরুদ মুহরেম এশ্‌কাস্ত ও এশ্‌ক মুহরেম উস্ত” অর্থাৎ কাউয়ালী কি বস্তু যে, উহাতে এতো এশ্‌ক এবং ব্যথা-বেদনার উৎপত্তি হয়ে থাকে। কাউয়ালী এশ্‌কের রহস্য এবং এশ্‌ক তাঁর রহস্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।” এ বয়েতটি হযরত কুতুবুল আকতাবের উপর এতো অধিক ভাবাবেগের সৃষ্টি করেছিল যে, তিনি সাতদিন পর্যন্ত বেহুঁশ হয়ে রইলেন। শুধুমাত্র নামাযের সময় তাঁর হুঁশ ফিরে আসতো এবং যথা সময়ে নামায আদায় করে আবার বেহুঁশ হয়ে পড়তেন।

হযরত কুতুবুল আকতাব সৈয়দ কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রহ.) এর ওফাতও এশ্‌কে এলাহীর মওজুদ অবস্থায় কাউয়ালী শ্রবণের প্রতিক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। জনৈক শেখ আহমদ জমির কাউয়ালীতে কসীদা পেশকালে যখন গেয়ে উঠেন, “কোশতেগানে খনজরে তসলীম রা! হারযমা আয গায়ব জানে দীগারাস্ত” অর্থাৎ, আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির সম্মুখে আত্মসমর্পণের খঞ্জরে যাঁরা নিহত হন তাঁরা প্রত্যেক সময় গায়েব হতে নিত্য নতুন প্রাণ লাভ করে থাকেন”-বয়েত শুনামাত্র হযরত কুতুবুল আকতাব পরম ভাবাবেগে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। এ ধরনের সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শুধুমাত্র নামাযের সময় ব্যতীত তিনি চার দিন চার রাত অতিবাহিত করে আল্লাহপাকের সান্নিধ্যে গমন করেন। আল্লাহপ্রেমিক মহান অলিদের এ ধরনের এশ্‌কের মেজাজ উন্মুক্ত বেলায়তের ধারণা ব্যতীত (বেলায়তে মোতলাকা) অনুধাবন করা অসম্ভব।

হযরত সৈয়দ কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রহ.) এর অমরবাণী সমূহ তাসাওউফ সাধকদের জন্য মহামূল্যবান পথ নির্দেশিকা। তিনি উল্লেখ করেন, “যে ব্যক্তি আমীর-ওমরা এবং দুনিয়াদার লোকদের সঙ্গে উঠাবসা করে সে ত্বরিকতের পথে ধর্মভ্রষ্ট।” দরবেশদের অনাহারে থাকা তাদের ইচ্ছাধীন; কেননা, সমগ্র দুনিয়াকে তার করতলগত করে দেয়া হয়েছে। সে যদৃচ্ছা ব্যয় করতে পারে, কিন্তু সে তা করে না বরং অন্যকে দান করে এবং নিজে অনাহারে থেকে আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নতি লাভ করে।” “যে ব্যক্তি খোদা প্রেমের দাবি করে এবং বিপদ-আপদের সময় চীৎকার করে বেড়ায়, সে প্রেমের দাবিতে মিথ্যাবাদী।” অসৎ সংসর্গের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর মানুষের জন্যে আর কিছু নেই।” মানুষ যে পর্যন্ত দুনিয়ার ধান্দায় মশগুল থাকে, সে পর্যন্ত আল্লাহ তা’আলার দরবারে পৌঁছতে পারেনা।” অসংখ্য কারামত এবং ঐশী জলোয়ার জলসাঘর হওয়া সত্ত্বেও হযরত কুতুবুল আকতাব নিজের রওজায় কোন প্রকার স্থাপত্য নির্মাণে নিষেধ করেছেন। দিল্লীর সুলতান ইলতুতনিশ তাঁর জানাযা নামাযে ইমামতি করেন।

হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন মাসউদ
গঞ্জেশকর (রহ.) [বাবা ফরিদ]

ভারত উপমহাদেশে তাওহীদ প্রচারের ক্ষেত্রে চিশ্‌তিয়া তুরিকার অবদান অবিস্মরণীয়। সুলতানুল হিন্দ খাজা গরীবে নেওয়াজ, হযরত খাজা কুতুবুল আকতাব, বাবা ফরিদ, মাহবুবে এলাহী হযরত নিজামুদ্দিন, হযরত খাজা আলী আহমদ সাবের কালিয়ার প্রমুখ সর্বজনমান্য পরম শ্রদ্ধেয় আউলিয়াদের আত্মত্যাগ, সীমাহীন, রিয়াজতের বিনিময়ে শান্তিপূর্ণভাবে পৌত্তলিকতা, যাদুবিদ্যা, কুসংস্কার এবং বহুত্ববাদীদের ধর্মকেন্দ্র ভারতে তাওহীদের পতাকা উড্ডীন হয়। হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (রহ.) এর তাওহীদ প্রচারের ধারা ভিন্ন মাত্রিকতার সঞ্চার করে। চিশ্‌তিয়া তুরিকার মধ্যে দেখা যায় কাউয়ালী-সামা ব্যতীত তাওহীদ প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁরা ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ নীতি এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে নতুন নতুন নিয়ম পদ্ধতি প্রচলন করেন। ফলে তুরিকায় বহুমাত্রিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। হযরত শেখ বাবা ফরিদ হলেন কুতুবুল আকতাব হযরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকীর (রহ.) প্রধান খলিফা। কঠোর-সুকঠিন রিয়াজত, আপন মুর্শিদের প্রতি পরম আনুগত্য, আত্মপ্রচার বিমুখতা, খ্যাতি-সুনাম প্রভৃতি পার্থিব চাহিদার প্রতি অনাগ্রহ থেকে অবিখ্যাত অপ্রসিদ্ধ থাকার আগ্রহ তাঁকে বেলায়তের শীর্ষ অবস্থানে উন্নীত করে। হেদায়তের লক্ষ্যে তাঁর অনেক কর্ম-প্রচলিত ধর্ম নীতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হলেও মূলতঃ তা ছিল পবিত্র কোরআনের নির্যাস।

একবার অজুধনের নিকটবর্তী গ্রামের জনৈক মোল্লা বাবা ফরিদের (রহ.) দরবারে আগমন করেন। মোল্লা সাহেব নিজের এলমের জন্যে খুবই গর্ব করতেন। ফকির-দরবেশদেরকে তিনি খুবই ঘৃণা এবং অবহেলার চক্ষে দেখতেন। বাবা ফরিদের (রহ.) দরবারে এসে তিনি উপস্থিত লোক সম্মুখে নিজের এলমের বাহাদুরী প্রকাশ করতে থাকেন। শয়খুল আলম বাবা ফরিদ ধৈর্য্য সহকারে তার এলমের কাহিনী শোনার এক পর্যায়ে জিজ্ঞেস করেন, “মাওলানা! ইসলাম ধর্মের রুকন কয়টি? মাওলানা সদস্তে উচ্চারণ করেন, ৫টি (ঈমান, নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত)। বাবা ফরিদ উত্তরে বলেন, “আমি ষষ্ঠ রুকনের কথাও শুনেছি। মোল্লা সাহেব রাগান্বিত হয়ে বলেন, “ষষ্ঠ রুকন বলে কিছু নেই। আপনি এ ধরনের কিছু শুনে থাকলে ভুল শুনেছেন।” বাবা ফরিদ পুনরায় উল্লেখ করেন ‘জ্বী-না, আমি একজন নির্ভরযোগ্য আলেম থেকে ষষ্ঠ রুকনের বিষয়টি শুনেছি। ইসলামের ষষ্ঠ রুকনটি হচ্ছে ‘রুটি’। এ কথা শুনে মোল্লা সাহেব অধিকতর রাগান্বিত হয়ে বলেন, “আপনাদের সঙ্গে এ জন্যেই আমাদের বিরোধ। আপনাদের এলম মোটেই নাই। থাকলেও খুবই সামান্য। অযথা আলেম সাজার জন্যে যে বিষয়ে কোন ধারণা নেই, তা নিয়েও কথা বলেন-অযথা হস্তক্ষেপ করেন। আমি যে পাঁচটি রুকনের কথা বলেছি তা হাদিস-ফিকাহের কিতাব সমূহে উল্লেখ আছে। ষষ্ঠ রুকন

সম্পর্কে হাদিস-ফিকাহের কোন কিতাবে কোনো কিছু উল্লেখ নেই। হযরত বাবা ফরিদ মুদু হেসে বলেন, “মাওলানা! ষষ্ঠ রুকনের কথা কোরআন, হাদিস এবং ফিকাহ’র কিতাব সমূহে আছে।” একথা শুনে মোল্লা সাহেব রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠেন, “আল্লাহপাক কোরআনে বলেছেন, “নসীহতের পর জালেম কওমের নিকট বসো না।” বাবা ফরিদ (রহ.) খুবই বিনয়ের সঙ্গে মোল্লা সাহেবকে বসতে অনুরোধ করলেও মোল্লা সাহেব চলে যান।

বাবা ফরিদের (রহ.) মজলিস থেকে রাগান্বিত হয়ে চলে আসার কিছুদিন পর মোল্লা সাহেব হজ্জ উপলক্ষে দীর্ঘ সফরে মক্কা শরিফ গমন করেন। সেখানে সাত বছর অবস্থান করে সাতবার পবিত্র হজ্জ সম্পন্ন করে। অবশেষে হিন্দুস্থানী এক জাহাজে উঠে দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। জাহাজ চার দিন চলার পর হঠাৎ সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ে পতিত হয়ে ডুবে যায়। মোল্লা সাহেব কোন ক্রমে জাহাজের একটি তকতায় আরোহণ করে কুলে এসে পৌঁছেন। সমুদ্র কুলের এ স্থানটি জনমানব শূন্য পাহাড়ী এলাকা, কোন গাছপালা, তৃণলতা নেই, শুষ্ক এবং অনূর্বর। কোন জলাধারও নেই। একাদিক্রমে তিনদিন তিন রাত অতিবাহিত হলেও জনমানবশূন্য এলাকায় কোন প্রকার খাবার তাঁর ভাগ্যে জুটে নি। ক্ষুধার জ্বলায় অস্থির হয়ে পাহাড়ের গুহায় বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন খাদ্যের খাজাঞ্চি নিয়ে এক ফেরিওয়াল সামনে দিয়ে যাচ্ছেন এবং বলছেন, “আমি রুটি বিক্রয় করি।” মোল্লা সাহেব তাঁকে ডেকে বলেন, “আমি একজন আলেম, সাতবার হজ্জ করেছি। দেশে ফেরার পথে আমাদের জাহাজ সমুদ্রে ডুবে ধ্বংস হয়ে গেছে। আমার হাতে কোন টাকা-পয়সা নেই আমি তিনদিন তিন রাত্রি অনাহারী। ফেরিওয়াল বলেন, “আমার নিকট খাদ্যদ্রব্য এবং পানি আছে। কিন্তু আমি দোকানদার। মূল্য ব্যতীত আমি এগুলো দিতে পারি না। মোল্লা সাহেব তখন জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি মুসলমান? আগস্তক বলেন, হ্যাঁ-আলহামদুলিল্লাহ! তখন মোল্লা সাহেব বিপদগ্রস্ত মুসাফিরকে সহায়তা করার ফজিলত সম্পর্কে দীর্ঘ বর্ণনা দেন এবং বলেন, “আমি ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত। আমাকে কিছু খাদ্য এবং পানীয় দিয়ে প্রাণ বাঁচান।” উত্তরে আগস্তক ফেরিওয়াল বৈশ্যধারী বলেন, “আপনি সব কিছু ঠিকই বলছেন, তবে আমি একজন দোকানদার। এসব বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করি। বিনা মূল্যে আমি এগুলো দিতে পারি না।” এ কথা বলে আগস্তক চলে যেতে উদ্যত হলে মোল্লা সাহেব বলেন, “আপনি কেমন মুসলমান? আমার বিপর্যস্ত অবস্থার প্রতি আপনার দয়া হয় না?” আগস্তক জবাবে বলেন, “এভাবে দয়া করতে গেলে আমার দোকানদারী শেষ হয়ে যাবে। তবে এ শর্তে খাবার ও পানীয় দিতে পারি-যদি আপনি মুখে বলেন যে, আপনার সাতবার হজ্জের সওয়াব আমাকে দান করেছেন।” (চলবে)

ইউসুফে সানি, গুলে গোলাব হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাঞ্জরী (ক.)

॥ আলোকধারা বিশেষ প্রতিবেদন ॥

প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাঞ্জরী (ক.) সম্পর্কে উল্লেখ করেন,

হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাঞ্জরী (ক.) এর বেলায়তি মর্যাদা সম্পর্কে ভক্তের উক্তি: ‘হযরত বাবা ভাঞ্জরী (ক.) আল্লাহর ‘রহমান’ গুণবিশিষ্ট বেলায়ত লাভ করেছিলেন। তিনি গোলাম রহমান নামের মূর্ত প্রকাশ ছিলেন। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে তিনি ছিলেন সকল অসহায়ের সহায়, সকলের মঙ্গল সাধনকারী হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি ছিলেন মহামহিম, দয়াবান, এশুক ও মোহব্বতের উজ্জ্বল প্রতীক। (ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, মাসিক আলোকধারা, মার্চ ২০০৭)

‘তায়কেরাতুল আউলিয়া’ গ্রন্থের পরম শ্রদ্ধাভাজন লেখক, কুতুবুল আলম হযরত শায়খ ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রহ.) (১১৪৫-১২২০) তাঁর লিখিত ‘পান্দ নামা’ কাব্যে উল্লেখ করেছেন, “প্রকৃত খোদাপ্রেমী দুনিয়া ও আখেরাত হতে বেখবর। আল্লাহ্ ব্যতীত সবকিছু থেকে সে বেখবর। খোদাপ্রেমীর উদ্দেশ্য হলো খোদার মোলাকাত। কেননা সে প্রভুর ভিতর একেবারে বিলীন হয়ে যায়।” একই বিষয়ে ‘মওলায়ে রুম’ আল্লামা রুমী (রহ:) (১২০৭-১২৭৩) মসনবী শরিফে উল্লেখ করেন, “আল্লাহ্ আল্লাহ্ গোপ্তা আল্লাহ্ মিশওদ। ইচ্ছুন কায় বাত্তরে মরদুম শওদ।” অর্থাৎ আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলতে বলতে মানুষ আল্লাহর অন্তিড়ে বিলীন হয়। এটি জনসাধারণের কাছে কি ভাবে পরিষ্কার ও প্রতিভাত হবে। গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাঞ্জরী (ক.) উপর্যুক্ত তথ্যধারা অনুযায়ী সীমাহীন ইবাদত, রিয়াজত এবং হযরত ঈসা (আ.) এর মতো নিঃসম্বল অবস্থায় ভ্রমণ করে করে পার্থিবতাবিমুখ চেতনায় ভাস্বর হিসেবে ‘মাহবুবে ইলাহী’ পদমর্যাদায় স্বীকৃত হন। এ মহান অলিকুল সম্রাটের জন্ম ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অক্টোবর মাইজভাঞ্জর দরবার শরিফে। তিনি বাংলার জমিনে প্রবর্তিত একমাত্র তুরিকা বিশ্ব সমাদৃত ‘তুরিকায় মাইজভাঞ্জরীয়া’র মহান প্রবর্তক, ফরদুল আফরাদ, খাতামুল অলদ, গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাঞ্জরী (ক.) (১৮২৬-১৯০৬) ড্রাতুপ্পুত্র। তাঁর সম্মানিত পিতার নাম হযরত সৈয়দ আবদুল করিম। জনৈক পর পিতা হযরত সৈয়দ আবদুল করিম নবজাতক বাবা

ভাঞ্জরীকে পিতৃব্য হযরত গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরী (ক.) সমীপে নিয়ে যান। তখন স্বীয় কোলে তুলে নিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরী (ক.) নবজাতকের পবিত্র বদন লক্ষ্য করে মন্তব্য করেন, “ইয়েহ হামারে বাগ কা গুলে গোলাব হ্যায়, হযরত ইউসুফ (আ.) কা চেহারা ইছমে আয়া হ্যায়। উছকো আজিজ রাখো। ম্যায়নে উছকা নাম গোলামুর রহমান রাখা।” অর্থাৎ এই শিশু আমার বাগানের গোলাপ ফুল। হযরত ইউসুফ (আ.) এর লাভণ্য তাঁর মধ্যে এসেছে। তাঁকে যত্ন করবে। আমি তাঁর নাম রাখলাম গোলামুর রহমান। মহান পিতৃব্য গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরী (ক.) এর উপর্যুক্ত পবিত্র কালাম পরবর্তী সময়ে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়।

হযরত বাবা ভাঞ্জরী (ক.) হলেন ঐশী প্রেমের তুরিকার উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি তাঁর মুর্শিদ হযরত গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরী (ক.) এর প্রতি যেভাবে প্রেম নিবেদন করেছেন তা মাইজভাঞ্জরীয়া তুরিকা অনুশীলনে অভিলাষী আল্লাহ্ প্রেমিকদের জন্য নমুনা স্বরূপ। শৈশবে সাধারণত সন্তান-সন্ততি মা-বাবার আদর-সোহাগে নিজেদের বেড়ে উঠার ধারাকে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। এ বিষয়েও ব্যতিক্রম ছিলেন বাবা ভাঞ্জরী (ক.)। তিনি হাঁটি হাঁটি পা পা অবস্থায় চলে আসতেন পিতৃব্য হযরত গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরী (ক.) এর হুজরা শরিফে। পিতৃব্যের দরদ এবং স্নেহ তিনি পরম স্নিগ্ধতায় অনুভব করতেন। পিতৃব্য তাঁকে ‘বাচা ময়না’ বলে ডাকতেন। মকতব-পাঠশালায় অধ্যয়নকালে বাড়ী ফিরে আসামাত্র কিতাব-খাতা টেবিলে রেখে দ্রুত চলে আসতেন পিতৃব্যের হুজরায়। স্বেচ্ছায় নিয়োজিত হয়ে পড়তেন পিতৃব্যের খেদমতে। শৈশবে আদব-আখলাকের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন পিতৃব্যের নিকট থেকে। প্রকৃতিজাত আভিজাত্য এবং প্রসারিত অন্তরের স্নিগ্ধ সৌরভে তিনি অতি সহজে পিতৃব্যের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। মূলতঃ তখন থেকে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরী (ক.) এর প্রেমবীণায় হযরত বাবা ভাঞ্জরী (ক.) বন্দী হয়ে পড়েন। তখনই হযরত গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরী (ক.)-কে আপন মুর্শিদ-মাওলা ধারণ করে সাধনা-রিয়াজতের দিকে একান্ত হয়ে যান।

হযরত বাবা ভাঞ্জরী (ক.) একাডেমিক শিক্ষা স্বগ্রামের মক্তবে শুরু হয়। শেষ হয় চট্টগ্রাম শহরের মোহসেনীয়া মাদরাসায় উলা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে। সেখানে শিক্ষারত অবস্থাতেই তিনি নিজেকে নিরলসভাবে আধ্যাত্মিক

সাধনা-রিয়াজতে নিমগ্ন রাখেন। তিনি ‘সিয়ামুদ্দাহার’ অর্থাৎ সকলের অজ্ঞাতে সারা বৎসর রোজা পালন করতেন। গভীর রাতে একাকী বের হয়ে যেতেন মসজিদের পানে। চট্টগ্রাম শহরের বহদার বাড়ীর মসজিদে নামাযে গমনের সময় জায়গীর বাড়ীর জামিনদার লক্ষ্য করলেন ঘর থেকে বের হয়ে কিছুদূর অগ্রসর হবার পর বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছেন তাঁর লজিং মাস্টার হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.)। পরে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন বহদার বাড়ীর মসজিদে সাদা পোশাকধারী একদল মুসল্লীর জামাতে হযরত বাবা ভাণ্ডারী ইমামতি করছেন। তখন থেকে তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা দেখাতে থাকেন লজিং বাড়ীর জামিনদার। এ বিষয়ে পল্লী কবি জসীম উদ্দীনের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য-

গোলামুর রহমান সাহেব অতি অল্প বয়স হইতেই হযরত আকদাছের অর্থাৎ হযরত আহম্মদ উল্লাহ (ক.) সাহেবের খেদমতে হাজির হইতেন। ১৫ বৎসর বয়সে তিনি ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত বাবুনগর নিবাসী মৌলভী মোবারক আলী সাহেবের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর চট্টগ্রাম মাদরাসায় [মুহসিনিয়া মাদরাসা] ভর্তি হন। সেখানে তিনি আসরাফ আলী সওদাগরের বাড়িতে জায়গীর থাকিতেন। এই সময় তিনি দিবা-রাত্রের মধ্যে মাত্র একবার সন্ধ্যায় আহার করিতেন, আর অধিকাংশ সময় খোদাই- ধ্যানে মশগুল থাকিতেন। (হযরত শাহসুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী, পল্লী কবি জসীম উদ্দীন, তায়কেরাতুল মাইজভাণ্ডারীয়া, ১ম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ- ২০১৮, আলোকধারা বুকস, পৃ.১৫)

ইতোমধ্যে তাঁর উলা পরীক্ষা সমাগত। পরীক্ষা প্রদানের বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনার জন্যে হাজির হলেন পিতৃব্য গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) কদমে। তখনই পিতৃব্য হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) রূপক কালামের মাধ্যমে তাঁর বেলায়তের সুউচ্চ মাকাম প্রাপ্তির প্রতি ইঙ্গিত করেন। এভাবে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) ফয়েজ-তাওয়াজ্জু লাভের পর উলা পরীক্ষার তৃতীয় দিবসে পরীক্ষা কক্ষে তাঁর হাল-জজবার সূত্রপাত ঘটে। বাড়ীতে নিয়ে আসা হলে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) শরবত পান করিয়ে তাঁর হাল-জজবা নিয়ন্ত্রণে আনেন। এরপর শুরু হয় তাঁর ভ্রমণজাত রিয়াজত। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ে, কর্ণফুলীর দক্ষিণ পাড়ের দেয়াং পাহাড়, খাগড়াছড়ির গহীন জঙ্গল এবং পাহাড়ের বাঘ-ভাল্লুক, বনের হিংস্র কুকুর, হাতি, সাপের অভয় অরণ্যে হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) অকুতোভয় ভ্রমণ ইশ্কে ইলাহীর নেশায় বিভোর প্রাণ-প্রবণতার অনুরণন। তাঁর প্রেম নেশা এ পর্যায়ে উপনীত হয় যে, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) সমীপে আগত পশ্চিম ভারতীয় এক দরবেশ হযরত বাবা

ভাণ্ডারীকে পর্যবেক্ষণ করে উল্লেখ করেন, “এই যুবকটির মধ্যে মনছুর হাল্লাজ, শামসে তাবরিয়, বুআলি কলন্দর ও হাফেজের মত প্রেমনেশা হয়েছে। তিনি সোরাই সোরাই প্রেম শরাব পান করে পরিতৃপ্ত হচ্ছেন না। শরাবের পাত্র সহ পান করতে চান। বেঁচে থাকলে তিনি অদ্বিতীয় অলী-আল্লাহ হবেন।” হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) নূরানি নজরে করমের বদৌলতে হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) অতুলনীয় মর্যাদাসম্পন্ন অলী-আল্লাহর শিরোভূষণ প্রাপ্ত হন। হযরত বাবা ভাণ্ডারী পার্থিব হায়াতে জিন্দেগীর সুদীর্ঘ তেইশ বছর নির্বাক থেকে কালতিপাত করেন। এ সময় তিনি প্রায়শঃ হুজুরা শরিফের আসনে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতেন। হঠাৎ পবিত্র হস্ত প্রসারিত করে হস্তে পানি ঢালার ইশারা করতেন। অনেক সময় ঘন্টার পর ঘন্টা অবিরত পানি ঢালতে হতো। স্বেচ্ছায় পবিত্র হস্ত চাদরস্থিত না করা পর্যন্ত পানি ঢালা চলত। তাসাওউফ সাধকদের ধারণা এটি সৃষ্টিরহস্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়। তাঁর নীরবতা সম্পর্কে ইমাম শেরে বাংলা সৈয়দ আজিজুল হক আল কাদেরী তাঁর ‘দেওয়ানে আজিজ’-এ উল্লেখ করেন:

‘ছো-যে-তাব্বুকায়ে ফানা ফিল্লাহ বক্বাবিল্লাহ রহিদ, মোহরে খামুশী দরাদম্ বর দাহানে খোদ কশিদ।’ অর্থাৎ, তিনি ফানাফিল্লাহ বক্বাবিল্লাহর স্তরে পৌঁছার পর নীরবতার মোহর নিজ মুখে নিজেই মেরে দেন। মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার খলিফাবন্দ হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.)-কে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) কালাম হচ্ছে, আমার বাগানের ‘গুলে গোলাব’, ‘ইউসুফে সানী’ এবং ‘আলম-আরোয়ায় ছায়ের রত’।

হযরত আল্লামা সৈয়দ আজিজুল হক আল কাদেরী তাঁর ‘দেওয়ানে আজিজ’-এ আরো উল্লেখ করেন-
ইউসুফে সানী বেলাশক বুদে দর আখের জঁমা,
মাজ্হারে নূরে খোদা উরা ব-দানী বেগুমা।
অর্থাৎ, বিল বিরাসাত গাউসুল আযম বাবা ভাণ্ডারী (ক.) নিঃসন্দেহে শেষ যুগের দ্বিতীয় ইউসুফ। তাঁকে নিঃসন্দেহে আল্লাহর নূরের বিকাশস্থল বলে মনে কর।
আজও অগণিত ভক্ত-অনুরক্ত-আশেক হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) ফয়েজ-রহমতে ধন্য হচ্ছেন। তাঁর পুণ্যস্মৃতি যিয়ারতের মাধ্যমে খুঁজে পাচ্ছেন, দহনক্লিষ্ট হৃদয়ের জন্য শান্তির অমৃত স্বচ্ছ জলধারা। খোদার জন্য তাঁর পবিত্র বিভোরতার আলোকছটা ভক্তদের তাপিত হৃদয়কে পথপ্রদর্শন করে চলছে অবিরত।

সোনালী অতীতের কুশলী নির্মাতা

শায়খ আবু আবদুর রহমান আস্ সুলামী (রহ.)

মূল আরবি থেকে অনুবাদ : আহমেদ জোবায়ের

'যিকরুন নিসওয়ালিল মুতাআক্বিদাতিস সুফিয়াত' (নারী সুফিদের জীবনকথা) সহ বহু তাসাওউফ গ্রন্থ প্রণেতা। শায়খ আবু আবদুর রহমান আস্ সুলামী (রহ.)

(সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ও অবদান)

হিজরি প্রথম শতক থেকেই তাসাওউফ ও যুহদ সম্পর্কে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। হিজরি ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত আমরা এ বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ লাভ করেছি। এই ধারায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা মনীষীদের মধ্যে শায়খ আবু আবদুর রহমান আস্ সুলামির নাম একেবারে শুরুতে উল্লেখ করতে হবে। তাঁর মতো এককভাবে তাসাওউফ সম্পর্কে এত বেশি মৌলিক গ্রন্থ আর কেউ রচনা করেননি।

শায়খ সুলামির পুরো নাম মুহাম্মদ ইবন আল হুসাইন ইবন মুহাম্মদ ইবন মুসা ইবন খালিদ ইবন সালিম ইবন যা-উইয়া ইবন সাঈদ ইবন কাবিসা ইবন সাররাক আল আযদি আস্ সুলামি। বাবার দিক থেকে তিনি আযদ গোত্রের এবং মায়ের দিক থেকে সুলায়ম গোত্রের ছিলেন। তিনি জমাদিউস সানি মাসের এক বুধবারে ৩২৫ হি./৯৩৬ খ্রি. খোরাসানে জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য ইমাম সুবকির একটি মতানুসারে তিনি রমজান মাসে ৩৩৩ হি. জন্মগ্রহণ করেন। এ মতটি সঠিক বলে মনে হয় না।

শায়খ আবু আবদুর রহমানের মা-বাবা উভয়েই সুফি ছিলেন। তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাঁর জন্মের পর তাঁর বাবা হুসাইন ইবন মুহাম্মদ সমস্ত সম্পদ দরিদ্রদের দান করে দেন। হুসাইন বিশিষ্ট সুফি শায়খ ইবনুল মুনাযিল, আবু আলি আস্ সাকাফি প্রমুখের সাক্ষাত লাভ করেছিলেন। শায়খ আবু উসমান আল হিরির শিষ্যদের সাথেও তাঁর দেখা হয়েছিল। তিনি আর্থিকভাবে তেমন সচ্ছল ছিলেন না। তবে তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ শায়খ সুলামির মা একইসাথে ধনী ও বিদুষী নারী ছিলেন। এজন্য আমরা দেখি শায়খ সুলামি যখন হজে যাচ্ছেন, তখনও তিনি পুত্রকে উপদেশ দিচ্ছেন, 'আল্লাহর ঘর যিয়ারতে যাচ্ছ। খেয়াল রেখ দুকাঁধের ফেরেশতা যেন এমন কিছু লিখতে না পারে, যাতে ভবিষ্যতে তোমাকে লাঞ্ছিত হতে হয়'।

পরবর্তীতে ৩৪৫ হিজরির কাছাকাছি কোনো এ সময়ে হুসাইন ইবন মুহাম্মদ ইত্তিকাল করেন। এরপর শায়খ আবু আবদুর রহমান সুলামির নানা আবু আমর ইসমাঈল ইবন নুজায়দ তাঁর শিক্ষাদীক্ষার তদারকি শুরু করেন। এজন্যই তিনি মায়ের গোত্র সুলায়ম থেকে সুলামি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

আবু আমর মালামতি সুফি তরিকার বড় মাপের শায়খ ছিলেন। তাঁকে কেউ কেউ আওতাদ হিসেবে গণ্য করেছেন। খোরাসানের সমকালীন বুয়ুর্গদের মধ্যে তিনিই ছিলেন

শ্রেষ্ঠতম। তিনি শায়খ জুনায়েদ বাগদাদি (ইত্তিকাল ২৯৭ হি./৯০৯ খ্রি.) ও আবু উসমান হিরি (ইত্তিকাল ২৯৮ হি./৯১০ খ্রি.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। ইমাম আহমদের ছেলে আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহিম আল বুশিনজি প্রমুখের কাছ থেকে তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

শায়খ আবু আমর ৯৩ বছর বয়সে ৩৬৬ হি./৯৭৬ খ্রি. ইত্তিকাল করেন। তাঁর কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। এজন্য তাঁর ইত্তিকালের পর উত্তরাধিকার সূত্রে শায়খ আবদুর রহমান প্রচুর সম্পদ লাভ করেছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া তার লাইব্রেরীটিকে তিনি সুফিদের খানকায় পরিণত করেন এবং নানাকে পাশেই কবরস্থ করেন। পরবর্তীতে তাঁর নিজের কবরও সেখানে হয়েছিল।

সুলামি প্রথমেই কুরআন কারিম হিফয করেন। এরপর তাফসির ও হাদিস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। শৈশব থেকেই তিনি জ্ঞানার্জনের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। মাত্র আট বছর বয়সে ৩৩৩ হিজরিতে তিনি ইমাম আবু বকর আস্ সিবিগির (ইত্তিকাল ৩৪২ হি./৯৫২ খ্রি.) কাছে দরসে বসে লেখা শুরু করেছিলেন। মুরাদ ইবন ইউসুফ আল হানাফি আশ শাযিলি 'শামসুল আফাক' নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, শৈশব থেকেই শায়খ সুলামি বড় বড় মাশায়েখের দরবারে যেতেন এবং যাহেরি ইলম শিখতেন। বিভিন্ন জ্ঞান সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পর তাঁরা তাকে ফতোয়া প্রদান ও শিক্ষাদানের অনুমতি দান করেন। এরপর থেকেই তিনি পাঠদান ও ফতোয়াদান শুরু করেছিলেন এবং আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে এসব ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তাওফিক দিয়েছিলেন।

তাসাওউফে তাঁর মূল শায়খ ছিলেন শায়খ আবুল কাসিম নাসরাবাযি (ইত্তিকাল ৩৬৭ হি./৯৭৭ খ্রি.)। তিনি দীর্ঘদিন নাসরাবাযির সাথে থেকেছেন, একসাথে বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেছেন। নাসরাবাযি তাঁকে নিজ হাতে খিরকা পরিয়েছিলেন। এই খিরকা তিনি পেয়েছিলেন শায়খ জুনায়েদ বাগদাদির শিষ্য আবু বাকর শিবলীর কাছ থেকে। এছাড়া শায়খ আবু সাহল সালুকি (ইত্তিকাল ৩৬৯ হি./৯৭৯ খ্রি.) তাঁকে খিরকা পরিয়ে তাসাওউফ শিক্ষা দিয়েছিলেন বলে মুরাদ ইবন ইউসুফ শাযিলি উল্লেখ করেছেন। তিনি শায়খ সুলামিকে চল্লিশ দিন নির্জনবাসসহ আল্লাহ্ তায়ালায় বিভিন্ন নামের জিকর শিক্ষা দিয়েছিলেন।

হাদিস, তাফসির, তাসাওউফ ও তারিখ সম্পর্কে উচ্চশিক্ষার জন্য শায়খ সুলামি হিজাজ, মার্ত, ইরাক, হামাদান, রায়সহ বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। এসময় তিনি অসংখ্য সুফি শায়খের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। অনেক জায়গায় তিনি

নিজেই শায়খ আবুল কাসিম নাসরাবায়ির সফরসঙ্গী ছিলেন। জ্ঞানের সন্ধানে ঘুরে ফিরেছেন চেনা-অচেনা শহরে-বন্দরে। তখন যে শহরেই কোনো হাদিস অথবা তাসাওউফের শায়খ পেয়েছেন, যথাসম্ভব জ্ঞানার্জন করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘আমি নাসরাবায়ির সাথে থাকতাম। কোনো শহরে আসলেই তিনি বলতেন, চলো আমরা হাদিস শুনতে যাই।’

এজন্য হাদিস, তাফসির ও তাসাওউফে তাঁর শায়খগণের তালিকা অনেক দীর্ঘ। ড. সুলায়মান ইবরাহিম আতশ ‘তিসআতু কুতুবিন ফি উসুলিত তাসাওউফি ওয়ায যুহদ’ গ্রন্থে তাঁর পঞ্চাশ জন শায়খের তালিকা দিয়েছেন। আমরা সেখান থেকে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি-

১. শায়খ আবুল কাসিম নাসরাবায়ি (ইত্তিকাল ৩৬৭ হি/৯৭৭ খ্রি.)

২. শায়খ আবু সাহল সালুকি (ইত্তিকাল ৩৬৯ হি/৯৭৯ খ্রি.)

৩. শায়খ আবু আমর ইসমাঈল ইবন নুজায়দ (ইত্তিকাল ৩৬৬ হি/৯৭৬ খ্রি.)

৪. আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদুস আল উনযি (ইত্তিকাল ৩৪৬ হি/৯৫৭ খ্রি.)

৫. শায়খ আবু তাযিব সাহল ইবন মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান সালুকি (ইত্তিকাল ৪০৪ হি/ ১০১৪ খ্রি.)। তিনি খোরাসানে শাফেঈদের ইমাম ছিলেন।

৬. শায়খ আবু নসর আস সররাজ (ইত্তিকাল ৩৭৮ হি/৯৮৮ খ্রি.)। তিনি বিখ্যাত ‘আল লুমা ফিত তাসাওউফ’ গ্রন্থের লেখক।

৭. ইমাম আবুল হাসান আলি ইবন উমর দারাকুতনি (ইত্তিকাল ৩৮০ হি/ ৯৯০ খ্রি.)। হাদিসশাস্ত্রে তাঁর সংকলিত সুনান অত্যন্ত বিখ্যাত ও বহুলভাবে চর্চিত।

৮. আবু বকর আল কাফফাল আশ শাশি (ইত্তিকাল ৩৬৬ হি/ ৯৭৬ খ্রি.)। তিনি তাফসির, হাদিস, ফিকহ ও ভাষাতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

শায়খ আবু আবদুর রহমান সুলামির সুখ্যাতি মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এজন্য তাঁর শিষ্য ও মুরিদেদের সংখ্যাও ছিল অগণিত। তাঁদের কয়েকজনের নাম আমরা উল্লেখ করছি:

১. ইমাম আবুল কাসিম কুশায়রি (ইত্তিকাল ৪৬৫ হি/ ১০৭২ খ্রি.)। ‘আল রিসালাতুল কুশায়রিয়াহ’, ‘লাতাইফুল ইশারাত’ ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত রচনা।

২. ইমাম আবু বকর আল বায়হাকি (ইত্তিকাল ৪৫৮ হি/ ১০৬৬ খ্রি.)। শুয়াবুল ইমান, দালায়েলুন নুবুয়াহ, আস সুনানুন কুবরা, আস সুনানুস সুগরা ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত সংকলন। বিশিষ্ট সুফি শায়খ আবু ইসমাঈল হারুন্নির উসতাদ ছিলেন।

৩. শায়খ আবু নুয়ায়ম ইম্পাহানি (ইত্তিকাল ৪৩০ হি/ ১০৩৮ খ্রি.)। ‘হিলয়াতুল আউলিয়া’ তাঁর বিখ্যাত রচনা। এ গ্রন্থে শায়খ সুলামির প্রতি তাঁর ঋণের কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন। শায়খ সুলামি নিজেও আবু নুয়ায়ম থেকে বর্ণনা করেছেন। এজন্য তাঁকেও কেউ কেউ আবু নুয়ায়মের শিষ্যদের

মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৪. শায়খ আবু সাঈদ আবুল খায়র (ইত্তিকাল ৪৪০ হি/ ১০৪৯ খ্রি.)।

৫. ইমাম হাকিম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরি (ইত্তিকাল ৪০৫ হি. / ১২১২ খ্রি.)। ‘আল মুসতাদরাক আলাস সাহিহায়ন’ তাঁর বিখ্যাত হাদিস সংকলন।

৬. আবু মুহাম্মদ আল জুয়ায়নী (ইত্তিকাল ৪৩৮ হি/ ১০৪৭ খ্রি.)। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত শায়েঈ ফকীহ। ইমামুল হারামাইন জুয়ায়নী ছিলেন তাঁরই পুত্র।

৭. হাফিজ আবু মনসুর উমর ইবন আহম আল জাওরি (ইত্তিকাল ৪৬৯ হি/ ১০৮৬ খ্রি.)।

পরবর্তী যুগে সুলামি নানা ধরনের সমালোচনার শিকার হয়েছেন। সুলামির ‘হাকাউকুত তাফসির’কে বাতেনিদের (অভ্যন্তরবাদী) প্রভাবযুক্ত বলা হয়েছে। বাতেনিগণ সমস্ত আয়াতের বাহ্যিক অর্থ ছাড়া একটি অভ্যন্তরীণ অর্থ আছে বলে মনে করেন। শিয়া সম্প্রদায়ের কিছু কিছু গোষ্ঠী এমতানুসারী। এছাড়া তাফসিরে ইমাম জাফর সাদিকের উক্তি উল্লেখকে অনেক সুন্নি আলেম সমালোচনা করেছেন। অথচ সুন্নিগণ ইমাম জাফর সাদিকসহ আহলে বায়তের সদস্যদেরকে সুফিদের রাহবার মনে করেন। সেই হিসেবেই তাঁদের উক্তি সুফিদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে শিয়াবাদের প্রশ্ন অবাস্তর। এছাড়া সুলামির সমসাময়িক হানাফি ফকিহ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আল কাত্তান সুলামিকে সুফিদের পক্ষে জাল হাদিস বর্ণনার দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। অবশ্য খতিবে বাগদাদি, তকিউদ্দিন সুবকি এই অভিমত খণ্ডন করেছেন। খতিবে বাগদাদি বলেন, “স্বদেশবাসীর কাছে আবু আবদুর রহমান সুলামি অত্যন্ত সম্মানিত। এছাড়া তিনি অত্যন্ত প্রশংসিত এবং হাদিসবিদ।”

খতিবে বাগদাদির এ মত উল্লেখ করার পর ইমাম সুবকি বলেছেন, ‘এক্ষেত্রে খতিবের বক্তব্য সঠিক। আবু আবদুর রহমান সুলামি সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য ছিলেন।’

সামআনি, খতিবে বাগদাদি, সুবকি প্রমুখ হাদিস শাস্ত্রে তাঁকে নির্ভরযোগ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

নিশাপুরে শায়খ আবু আবদুর রহমান সুলামি একটি ছোট্ট খানকাহ তৈরি করেছিলেন। শেষ জীবনে সেখানেই তিনি পাঠদান ও লেখালেখিতে ব্যস্ত থাকতেন। অবশেষে ৮৭ বছর বয়সে ৩ শাবান ৪১২ হি./ ১২ নভেম্বর ১০২১ খ্রি. রবিবার তিনি ইত্তিকাল করেন। প্রচুর মানুষ তাঁর জানাযায় অংশ নিয়েছিল। এরপর এই খানকাহ’র পাশেই তাঁকে কবর দেয়া হয়। এই ছোট্ট খানকাহটি তখন থেকেই বেশ বিখ্যাত ছিল। খতিবে বাগদাদি যখন নিশাপুরে আসেন, তখনও এই খানকাহ’য় এসেছিলেন। তিনি বলেছেন, ‘নিশাপুরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি ছোট্ট খানকাহ আছে। সুফিগণ সেখানে থাকেন। সেখানে তাঁর কবর যিয়ারত করে তাঁরা তাবাররুক হাসিল করেন। আমিও সেটি পরিদর্শন করেছি এবং যিয়ারত করেছি।’

লেখালেখির দিক থেকে সমসাময়িক সুফি ও মুহাদ্দিসদের মধ্যে

শায়খ সুলামি সবার চেয়ে অগ্রণী ছিলেন। তাঁর লেখার সূত্র ধরেই তাসাওউফের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশধারা, সুফিদের ইতিহাস ও শিক্ষার এক বিরাট অংশ আজও আমাদের জানার সুযোগ আছে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, নানার কাছ থেকে শায়খ সুলামি (র.) প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হয়েছিলেন। এজন্য আয়-উপার্জন সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা ও প্রচেষ্টা থেকে তিনি পুরোপুরি মুক্ত ছিলেন। তাই দেশে-বিদেশে অসংখ্য শায়খের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করে ফিরে আসার পর তাঁর বেশিরভাগ সময়ই ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে অধ্যয়ন ও লেখালেখি করেই কেটে গেছে। আনুমানিক ৩৫০ হিজরিতে শায়খ সুলামি লেখালেখি শুরু করেন। তাহলে ধরে নিতে হয় ষাট বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি লেখালেখি চালিয়ে গিয়েছিলেন।

ইমাম যাহাবি বলেছেন, ‘তিনি তাসাওউফ শাস্ত্র নিয়ে ৭০০ খণ্ড লিখেছেন। এছাড়া বিষয়ের আলোকে, শায়খের আলোকে এবং অন্যান্য প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস নিয়ে আরও ৩০০ খণ্ড লিখেছেন।’

ইমাম যাহাবি জুয বা খণ্ড শব্দটি ব্যবহার করলেও আমাদের ধারণা- এখানে বইয়ের খণ্ড উদ্দেশ্য নয়। তিনি যেসব খাতায় লিখতেন, সেগুলোই একেকটি খণ্ড হিসেবে ধরা হয়েছে। সে হিসেবে তাঁর গ্রন্থসংখ্যা আরও অনেক কম হবার কথা। কার্ল ব্রোকেলম্যান এজন্য তাঁর একশটি বইয়ের কথা লিখেছেন, যার অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। তাঁর কিছু গ্রন্থ ও পুস্তিকার তালিকা নিম্নরূপ:

১. তাবাকাতুস সুফিয়াহ। সুফিদের জীবনীভিত্তিক এ গ্রন্থটি বর্তমানে এ বিষয়ে একক রেফারেন্সের মর্যাদা রাখে। এ গ্রন্থে ফুদায়ল ইবন আইয়াদ থেকে শুরু করে আবু আবদুল্লাহ আদ দিনাওয়ারি পর্যন্ত মোট ১০৪ জন সুফির জীবন, শিক্ষা ও চিন্তাধারা আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটি এ বিষয়ে পরবর্তীতে যা কিছু রচিত হয়েছে, সবগুলোর জন্য আকরগ্রন্থ হিসেবে গণ্য হয়েছে। ‘নারী সুফিদের জীবনকথা’ শীর্ষক এ অনুবাদও ‘তাবাকাতুস সুফিয়াহ’ এর একটি অংশ হিসেবে অনেকে মনে করেন। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

২. উয়ুবুন নাফসি ওয়া মুদাওয়াতুহা। এ গ্রন্থটি সম্প্রতি জনাব আবদুল্লাহ আল মাসউদ ‘আত্মশুদ্ধি’ নামে বাঙলায় অনুবাদ করেছেন।

৩. দারাজাতুল মুআমালাত। এটা সুফি পরিভাষার ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

৪. আল ফুতুওয়াহ। এ গ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুদিত হয়েছে। এতে সুফিদের কিছু উত্তম আচরণ তুলে ধরা হয়েছে।

৫. মাকামাতুল আউলিয়া। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবি (র.) তাঁর একটি বইতে এটার সাহায্য নিয়েছেন।

৬. আস্ সামা। নাম থেকে অনুমান করা যায় গ্রন্থটিতে আধ্যাত্মিক সংগীত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটার কথা ‘কাশফুল মাহজুব’-এ শায়খ আলি হুজভিরি দাতা গঞ্জে বখশ লাহোরী (র.) উল্লেখ করেছেন।

৭. তারিখ আহলিস সুফফাহ। এ বইটিতে আহলে সুফফাদের নামের তালিকা ও পরিচয় উদ্ধৃত হয়েছে। হাজি খলিফা এটাকে ‘তাবাকাতুস সুফিয়াহ’ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি এটার নাম ‘তারিখ আহলিস সাফওয়াহ’ নামে উল্লেখ করেছেন।

৮. আয যুহুদ। এ গ্রন্থে কয়েকজন সাহাবি, তাবেঈ ও তাবেউত তাবেঈর জীবনী আলোচনা করা হয়েছে।

৯. আল আরবাসিন ফিল হাদিস। এটি তাসাওউফ সম্পর্কে চল্লিশটি হাদিসের একটি সংকলন।

১০. রিসালাতুন ফি গালাতাতিস সুফিয়াহ। এতে কোনো কোনো সুফির বিভিন্ন বিভ্রান্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ‘কিতাবুল আগালিত’ নামেও গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ। জাওয়াদ আনওয়ার কুরেশি The Books of Errors: A Critical Edition and Studz of Kitab al-Aghalit by Abu Abd al-Rahman al-Sulami (ই. ৪১২/ ১০২১) শিরোনামে খিসিস উপস্থাপন করে ইউনিভার্সিটি অব জর্জিয়া থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেছেন।

১১. আস সুআলাত। শায়খ সুলামি তাঁর শায়খ ইমাম দারাকুতনির কাছে হাদিসের বিভিন্ন রাবি বা বর্ণনাকারী নিয়ে কিছু প্রশ্ন রেখেছিলেন। এ গ্রন্থটিতে সেসব প্রশ্ন ও তার আলোকে দেয়া দারাকুতনির জবাব একত্রিত করা হয়েছে।

১২. আস সাইহুর ফি নাকদিদ দুহুর। গ্রন্থটির নাম থেকে মনে হয় বিশ্বজগতের নিত্যতায় বিশ্বাসী দাহরিয়া সম্প্রদায়ের মতবাদ খণ্ডনে এটা লেখা হয়েছিল। কুরআনে ব্যবহৃত ‘ইয়ুসহারু’ (বিগলিত করা হবে) থেকে ‘সাইহুর’ শব্দটি নেয়া হয়ে থাকবে। এ প্রসঙ্গে একটি অলৌকিক ঘটনা ইমাম কুশায়রি ‘আর রিসালাতুল কুশায়রিয়া’য় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি একদিন উস্তাদ ইমাম আবু আলির কাছে ছিলাম। তখন শায়খ আবু আবদুর রহমান আস্ সুলামির কথা উঠল যে তিনি দরবেশদের সাথে মিল রেখে সামা গুনে দাঁড়িয়ে যান। তখন উস্তাদ আবু ‘আলি বললেন, ‘তাঁর মতো [আধ্যাত্মিক] অবস্থার শায়খ [এমন করেন]! সম্ভবত তাঁর ব্যাপারে চূপ থাকাই উত্তম।’ এরপর ঐ মজলিসেই আমাকে আদেশ দিলেন, ‘তাঁর কাছে যাও। তাঁকে তাঁর লাইব্রেরিতে বসা অবস্থায় পাবে, যাতে হুসাইন ইবন মানসুরের কবিতা আছে। তুমি তাঁকে কিছু না বলে সেটা নিয়ে আমার কাছে চলে আসবে।’ তখন ছিল মধ্যদুপুর। আমি এসে সুলামিকে তাঁর লাইব্রেরিতে পেলাম। তিনি যেমন উল্লেখ করেছিলেন বইয়ের খণ্ডটিও তেমনি ছিল। আমি বসতেই শায়খ আবু রাকাব রহমান আস্ সুলামি বলতে শুরু করলেন: ‘এক লোক আরেক আলিমকে সামা’র মধ্যে নড়াচড়ার জন্য অপছন্দ করত। অথচ সেই লোককেই একদিন দেখা গেল নিজের বাড়িতে উন্মত্ত হয়ে একাকি ঘুরছেন। তাকে এমন অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, ‘আমি একটি মাস’আলা সমাধান করতে পারিনি। হঠাৎ এর অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।’

আমি আনন্দ সামলাতে পারলাম না। তাই দাঁড়িয়ে ঘুরতে লাগলাম।’ তখন তাকে বলা হলো, ‘সুফিদের অবস্থাও এমনি হয়ে থাকে।’

আমি যখন দেখলাম উস্তাদ আবু ‘আলি আমাকে যা আদেশ দিয়েছিলেন, বইয়ের উপর লাল বইটির যেভাবে থাকার কথা বলেছিলেন এবং শায়খ আবু আবদুর রহমানকে তাঁকে নিয়ে একটু আগে আবু ‘আলির বলা কথার দিকে ইঙ্গিত করতে দেখে আমি দিশেহারা হয়ে পড়লাম। নিজেকে বললাম, ‘এ অবস্থায় তাদের দু’জনের মাঝে কী ভাবে সমন্বয় করি?’

ভেবে দেখলাম সত্য বলা ছাড়া কোন উপায় নেই। তাই বললাম, ‘উস্তাদ আবু ‘আলি আমাকে এই বইটির বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, ‘শায়খের অনুমতি না নিয়েই সেটা নিয়ে আসবে।’ আমি এখন আপনাকে ভয় পাচ্ছি। আমার পক্ষে তাঁর আদেশ অমান্য করাও সম্ভব নয়। এখন আপনি আমাকে কী আদেশ দেন?’

তিনি তখন হুসাইনের বাণী সম্বলিত ছয়টি খণ্ড বের করলেন। [এরমধ্যে] একটি খণ্ড তাঁর নিজের লেখা ছিল। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন, ‘কিতাব আস সাইহুর ফী নাকুদ্ব আদ দুহুর’। তিনি বললেন, ‘এটা তাঁর কাছে নিয়ে যাও। তাকে বলবে, আমি ঐ খণ্ডটি অধ্যয়ন করেছি এবং আমার রচনায় সেখান থেকে অনেক পঙ্ক্তি এনেছি।’ এরপর আমি বের হয়ে আসলাম।’

১৩. কিতাবুল মাকনুন ফি মানাকিবি যিন-নুন। এ গ্রন্থে তাসাওউফের জনক হিসেবে স্বীকৃত শায়খ যুন-নুন মিসরির মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১৪. মিহানুস সুফিয়্যাহ। যুগে যুগে বিশিষ্ট সুফি শায়খগণ নানাভাবে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের হাতে অপমানিত ও নিপীড়িত হয়েছেন। তেমন কিছু ঘটনা এ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫. মাসাইল ওয়ারাদাত মিন মাক্বা। শায়খ সুলামির কাছে মক্বাবাসীরা কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। এ পুস্তিকায় তেমন সাতটি প্রশ্ন উত্তরসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬. মানাহিজুল আরেফিন।

১৭. হাকাইকুত তাফসির।

১৮. রিসালাতুল মালামতিয়া বা উসূলুল মালামতিয়া।

১৯. জাওয়ামিউ আদাবিস সুফিয়্যাহ।

২০. তারিখুত সুফিয়্যাহ।

২১. আমসালুল কুরআন।

২২. বায়ানু আহওয়ালিস সুফিয়্যাহ।

২৩. আল ফারকু বাইনাশ শারিয়াহ ওয়াল হাকিকাহ।

২৪. দারাজাতুস্ সাদিকিন।

২৫. আল ইখওয়াতু ওয়াল আখাওয়াত মিনাস সুফিয়্যাহ।

২৬. আল মালামতিয়্যাহ।

২৭. মাসাইল ওয়ারাদাত মিন মাক্বা।

২৮. আল মুকাদ্দিমা ফিত্ তাসাওউফ ওয়া হাকিকাতিহি।

২৯. আর রাদ্দ আলা আহলিল কালাম।

৩০. সুনানুস সুফিয়্যাহ।

৩১. তাহযিবুন নাসিখ ওয়াল মানসুখ ফিল কুরআন লি ইবনি শিহাব আয যুহরি।

৩২. ওয়াসিয়্যা।

৩৩. আদাবুত তাআযি।

৩৪. জাওয়ামিউ আদাবিস সুফিয়্যাহ।

৩৫. আদাবুস সুহবাতি ওয়া হুসনিল ইশরাহ।

৩৬. আদাবুল ফাকরি ওয়া শারাইতুহু।

৩৭. আল ইসতিশহাদাত।

৩৮. বায়ানু আহওয়ালিস সুফিয়্যাহ।

৩৯. বায়ানু যিলালিল ফুকারা ওয়া মাওয়াজিবু আদাবিহিম। সম্ভবত এটির অপর নাম ‘তযাল্লুল ফুকারা’। তেহরান থেকে প্রকাশিত শায়খ সুলামির রচনাসমগ্রের তৃতীয় খণ্ডে এটি স্থান পেয়েছে।

৪০. তারিখুস সুফিয়্যাহ।

৪১. আদাবু মুজালাসাতিল মাশাইখ ওয়া হিফজু হুরমাতিহিম।

৪২. মাহাসিনুত তাসাওউফ।

৪৩. হিকামুন মুনতাখাবাতুন মিন আকওয়ালিল উলামা।

৪৪. ফুসুলুন ফিত তাসাওউফ।

৪৫. শারহু মাআনিল হুরুফ।

৪৬. মাত তাসাওউফ ওয়া মানিস সুফি?

৪৭. মুসতাখরাজ মিন হিকায়াতি হামদুন আল কাসসার।

৪৮. রিসালাতুন ফি মারিফাতিল্লাহ।

৪৯. রিসালাতু রাওদাতিল মুরিদিন।

৫০. কিতাবু বায়ানিশ শারিয়াহ ওয়াল হাকিকাহ।

৫১. কালামুশ শাফেঈ ফিত তাসাওউফ।

৫২. যিকরু আদাবিস সুফিয়্যাহ ফি ইতইয়ানিহিম আর রুখসাহ।

৫৩. সুলুকুল আরিফিন।

৫৪. মাসআলাতু দারাজাতিস সাদিকিন।

৫৫. মাদারুশ শারিয়াহ।

৫৬. মুকাদ্দামাতুন ফিত তাসাওউফ।

সুলামির অনেক রচনাই আজকে কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। এরপরও তাঁর প্রভাব পরবর্তী যুগের সব ধরনের সুফি সাহিত্যেই লক্ষ্যণীয়। ইমাম কুশায়রি তাঁর রিসালার প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় আবু আবদুর রহমান আস্ সুলামির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এছাড়া আলি হুজভিরি, ইমাম গাযালী, আবু হাফস সুহরাওয়ার্দী, খতিবে বাগদাদি, আবু নুয়াইম ইস্পাহানি, ইবনুল আরাবিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরবর্তীতে যারাই কলম ধরেছেন, তাঁর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাঁর গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছেন। তাসাওউফের ইতিহাসে প্রাচীন আর বর্তমান যুগের মাঝে শায়খ সুলামি তাঁর লেখনির মাধ্যমে আজও একটি সেতু হিসেবে রয়ে গেছেন।

ফীহি মা ফীহি (মওলানা রুমীর উপদেশ বাণী)

● অনুবাদক: কাজী মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন ●

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমি (মওলানা রুমী) দুনিয়াবী তথা পার্থিব বিষয়াদির খাতিরে আমীরকে পছন্দ বা তোয়াজ করি না, তাঁর পদবী, জ্ঞান বা অর্জনের খাতিরেও নয়। অন্যান্যরা ওইসব কারণে তাঁকে পছন্দ করে থাকতে পারে, তবে তা তাঁর চেহারা দেখে নয়, বরং শুধু তাঁর পিঠ দর্শন করেই। আমীর হলেন আয়নাসদৃশ, যার পৃষ্ঠদেশে খোদাইকৃত রয়েছে দামী মুক্তো ও স্বর্ণখচিত কারুকাজ বা নকশা। যারা সোনা ও মুক্তো পছন্দ করে, তারা আয়নার পৃষ্ঠদেশের দিকে তাকায়; কিন্তু যারা খোদ জীবনকে ভালোবাসেন, তাঁরা দর্পণটির দিকে তাকান এবং ওর খাতিরেই ওকে ভালোবাসেন। তাঁরা যে অনিন্দ্য সৌন্দর্য দেখতে পান, তাতে তাঁরা হাঁপিয়ে ওঠেন না। কিন্তু যাদের চেহারা কলঙ্কপূর্ণ হওয়ায় বিকৃত, তারা আরশিতে কেবল কুৎসিত চেহারা-ই দেখতে পায়। তারা তাড়াতাড়ি আয়নাকে ঘুরিয়ে ওইসব মূল্যবান পাথরের খোঁজ করে। তবু দর্পণটির চেহারায় কী-ই বা ক্ষতি হতে পারে, যদি তার পিঠে এক হাজার ধরনের কারুকাজ ও মূল্যবান পাথরখচিত হয়? “বিভিন্ন বিষয়ের বিপরীত বিষয়গুলো দ্বারাই সেগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।”

কোনো বস্তুকে তার বিপরীত বস্তু ছাড়া জানা একেবারেই অসম্ভব। তবু আল্লাহ পাকের কোনো বিপরীত নেই। তিনি এরশাদ করেন, “আমি ছিলাম রহস্যের গুপ্ত ধনভাণ্ডার, অতঃপর প্রকাশ হতে চাইলাম।” তাই তিনি এই অন্ধকার জগত সৃষ্টি করেন যাতে তাঁরই নূর তথা জ্যোতি দৃশ্যমান হয়। একইভাবে তিনি তাঁর আশিয়া (আ.) ও আউলিয়া (রহ.)-বৃন্দকে প্রকাশ করেন এ কথা বলে, “আমার বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আমারই সৃষ্টিজগতে গমন করুন।” তাঁরা হলেন খোদায়ী নূরের প্রকাশস্থল, যেখানে মিত্রকে শত্রুর থেকে আলাদাভাবে চেনা যায়, আর ভাইকে অপরিচিতের কাছ থেকে পৃথক করা যায়।

আউলিয়া-দরবেশদের সংগ্রাম-সাধনা খোদাতা'লার বিপরীতকে প্রকাশ করে দেয়, যদিও তাঁর কোনো বিপরীত নেই। হযরানি ও বিরোধিতার মাধ্যমেই আউলিয়া কেরাম পরিচিতি লাভ করেন এবং শত্রুর পাত্র হন। “আল্লাহর নূরকে অবিশ্বাসীরা কথায় নিভিয়ে দিতে সর্বদা চেষ্টারত, কিন্তু বিরোধিতার মুখেই আল্লাহ আপন নূরের পূর্ণতা দেন সতত।” আল্লাহতা'লা কিছু মানুষকে ধনসম্পদ, সোনাদানা ও শাসনকর্তৃত্বভারের শাস্তি দ্বারা পরিশুদ্ধ করেন, কেননা ওই অর্থবিত্ত হতে রূহ (আত্মা) দূরে সরে যায়। হযরত শামস-এ-তাবরিয় (মওলানার পীর) একবার আরবদেশের এক রাজাকে দেখতে পান যার জ্বর ওপর আশিয়া (আ.) ও আউলিয়া (রহ.)-বৃন্দের নূর জ্বলজ্বল করছিল। হযরত শামস

(রহ.) বলেন, “আল্লাহর কী মহিমা, তিনি বিত্তবৈভবের শাস্তি দ্বারা তাঁরই বান্দাদের পরিশুদ্ধ করেন!”

উপদেশ বাণী ১৮

কেউ একজন বলেন: “ইবনে মুকুরী শুদ্ধভাবে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করেন।” মওলানা রুমী (রহ.) বলেন: হ্যাঁ, সে কুরআন মজীদের (বাহ্যিক) পঠনরীতি অনুযায়ী শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করে ঠিকই, তবে এর (অন্তর্নিহিত) অর্থ সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। এই বাস্তবতার প্রমাণ তখনই মেলে, যখন তাকে এর অর্থ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় আর সে জবাব দিতে পারে না। সে অন্ধের মতো তেলাওয়াত করে। সে এমন এক ব্যক্তির মতো, যে তার হাতে লোমশ জন্তুর একখানি পুরোনো ছেঁড়া চামড়া ধরে রেখেছে; তাকে আরো নতুন, মসূন চামড়া দেয়ার কথা বলা হলেও সে তা ফিরিয়ে দিচ্ছে। অতএব, আমরা দেখতে পাচ্ছি সে (ইবনে মুকুরী) লোমশ জন্তুর চামড়া কী জিনিস তা-ই জানে না। কেউ তাকে এসে বললো এটি-ই লোমশ জন্তুর চামড়া, আর সে তৎক্ষণাৎ একে অন্ধভাবে তা-ই মনে করে বসে।

এ যেন শিশুদের আখরোট নিয়ে খেলা করার মতো কোনো ব্যাপার। তাদেরকে খোদ ওই আখরোট দিতে চান, কিংবা ওর তেল, (দেখবেন) অমনি তারা তা ফিরিয়ে দিয়ে বলবে, “আখরোট হচ্ছে যেটি আমরা টেবিলে ঘুরাই। এটি তো ঘুরে না।” আল্লাহ পাকের ধনভাণ্ডার অনেক, আর জ্ঞান-প্রজ্ঞাও অনেক। সে (ইবনে মুকুরী) জ্ঞানের ভিত্তিতে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করে থাকলে কেন অপর চিরন্তন কুরআন (-এর বাণী) প্রত্যাখ্যান করে?

একবার আমি জনৈক কুরআন-শিক্ষকের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলাম এ কথা: (দেখুন) কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে, “আমার প্রভুর বাণী (লেখা)র জন্যে যদি সাগরের পানি কলমের কালি হতো, তবে সাগর নিঃশেষ হয়ে যেতো কিন্তু প্রভুর বাণী ফুরাতো না” (ভাবানুবাদ)। এখন, কালি পরিমাপের পঞ্চাশটি একক দ্বারা যে কেউ গোটা কুরআন মজীদ নকল করতে পারেন। অতএব, আল-কুরআন হলো খোদাতা'লার জ্ঞান ও তাঁরই মালিকানাধীন সকল জ্ঞানের কেবল-ই একটি চিহ্ন বা প্রতীক।

কোনো ওষুধ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা একখানি কাগজে এক চিমটে ওষুধ রাখেন। আপনি এ কথা বলবেন না, “ওষুধ প্রস্তুতকারকের দোকানের সব কিছুই ওই কাগজে বিদ্যমান।” তা বলা বেকুবি হবে। বস্তুতঃ সর্ব-হযরত মূসা (আ.), ঈসা (আ.) ও অন্যান্য পয়গম্বর (আ.)-বৃন্দের সময়েও কুরআন মজীদের অস্তিত্ব ছিল। আল্লাহর কালাম তথা বাণীর অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু তা আরবী ছিল না। (চলবে)

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর (ক.)

দুই ময়না: 'বাচা ময়না' ও 'দেলা ময়না'

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

॥ ১ ॥

১৮৬৫ সালে ১৪ অক্টোবরের সোমবার গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর (ক.) কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল করিম মাইজভাগুরীর ঘরে ভোর বেলায় 'বেলায়তে মোতলাকা' যুগের রাজধানী মাইজভাগুর শরিফে জন্মগ্রহণ করেন রূপ-লাবণ্যে দৃষ্টান্তরূপ এক সন্তান। আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীসহ বেলায়ত নগরীর প্রত্যেকে নবজাতকের চেহারা মোবারক দেখে আনন্দে মুখরিত হয়ে যাচ্ছেন। যেন নবজাতকের চেহারা মোবারকই বলে দিচ্ছে সে গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর বেলায়তের মহান বাগানের (তুরিকার) ফুল ও তাঁর এক মহান প্রতিনিধি। স্বত্বব্য, তৎসময়ের বহু আগে গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর (ক.) অলৌকিক দ্রাণ কর্তৃত্বের যশ-খ্যাতি বাংলা, বার্মা, হিন্দুস্তান, পাকিস্তান তথা সমগ্র উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। তদুপরি এত বড় অলিউল্লাহ নবজাতকের বড় জেঠা এই পবিত্র নগরীতে অবস্থান করছেন- মঙ্গলের জন্য তাড়াতাড়ি বড় ভাইয়ের কাছে নিজ সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া সন্তানকে নিয়ে গেলেন পিতা। ঠিক তখনই পবিত্র জবানে গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর (ক.) অমৃতময় বাণী- "ইয়ে হামারে বাগ কা গোলে গোলাব হ্যায়, হযরত ইউসুফ (আ.) কা চেহারা ইছিম্বে আয়া হ্যায়। উসকো আজিজ রাখো। মাইনে উসকা নাম গোলাম রহমান রাখহা।" অর্থাৎ এ শিশু আমার বাগানের গোলাপ ফুল। হযরত ইউসুফ (আ.)'র রূপ-লাবণ্য তার মধ্যে এসেছে। তাকে যত্ন করিও। আমি তার নাম গোলামুর রহমান রাখলাম।" ছয় বছর বয়সে শিশু গোলামুর রহমানের হাতেখড়ি হয়েছিল পিতৃব্য গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর (ক.) হাতে। পঁচিশ বছর বয়সে জামায়াতে উলার ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার তৃতীয় দিনে পরীক্ষার কাগজ-কলম দূরে নিক্ষেপ করে বলতে লাগলেন 'আসিয়াছেন আপনি, আসিয়াছেন আপনি, কষ্ট স্বীকার করিয়া কেন আসিলেন? আমি মাথায় হাঁটিয়া আপনার খেদমতে হাজির হইতাম'। শুরু হল প্রেম সাগরের অগ্নি পরীক্ষা। খাজা গরিবে নেওয়ানের ভাষায়-প্রেম এমন এক অগ্নি যা কিছু এর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে, সেসবই জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেবে। এ অবস্থাতেই এসে হযরত রাবেয়া বসরী আশুন-আশুন বলে চিৎকার করতে লাগলেন। বসরার লোকজন চিৎকার শোনে পানি ভর্তি পাত্র সঙ্গে নিয়ে আশুন নেভানোর জন্য দৌড়াতে লাগলেন। একজন বুজুর্গ পশ্চিমধ্যে তাদের পথরোধ করে বুঝালেন, রাবেয়ার আশুন পৃথিবীর আশুন নয়। ঐ আশুন ইশ্কে ইলাহির আশুন, দুনিয়ার কোন বস্তুতেই নেভানোর নয়। রাবেয়ার অন্তরে ইলাহির প্রেমের প্রখরতা এত প্রবল হয়েছে যে, এখন তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এখন এ আশুন প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের আগে আর নেভানোর নয়। হযরত মনসুর হাল্লাজকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, প্রেমের পরিপূর্ণতা

কী? উত্তরে বললেন, "কেউ যখন প্রেমাস্পদের মোশাহেদায় ইলাহির নুরের দর্শনে এমনভাবে নিবিষ্ট থাকে যেন তাকে মারুক-কাটুক তবুও তার তন্ময়তায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না। তাহলে (তখন) তাকে আশেকে কামেল বা পরিপূর্ণ প্রেমিক বলা চলবে"। গাউসুল আযম বিল বিরাসত মওলানা শাহ সূফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাগুরী (ক.) দিনের পর দিন আহাির না করে শীতের ঠান্ডা হাওয়াকে উপেক্ষা করে নিজ মুর্শিদের চরণের পানে অনবরত তাকিয়ে থাকতেন অশ্রুসিক্ত নয়নে। মাঝে মাঝে পবিত্র চরণ ধরে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। পবিত্র চরণ থেকে জোরপূর্বক কেউ নিয়ে গেলে 'ছাড়িয়া দাও, দেখিতে দাও, আমার প্রাণ যায়' বলে চিৎকার করে চৈতন্যহীন হয়ে পড়তেন। তিনি জালালিয়ত বা ভাব-বিভোর অবস্থায় থাকলে মানুষকে প্রায়শ আঘাত করতেন। একবার হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর আত্মীয় ও ফয়েজপ্রাপ্ত খলিফা হযরত আবদুল মজিদ মিঞাকে মজলিশে থাকা অবস্থায় বাতির থাক দিয়ে প্রহার করার পর তিনি গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর সামনে গেলে গাউসুল আযম মাইজভাগুরী তাকে বললেন- 'ভাই, উহ সাহেবে জালাল হ্যায়। মুলকে এমন মে রাহতা হ্যায়, আলমে আরওয়াহ মে সায়ের করতা হ্যায়। আপ তো হামারা ছাত রহিয়েগা, উনকে পাস কেউ গেয়া?' অর্থ- ভাই, সে হাল জজবায় বিভোর ছিল। তাই মজলিশে থাকা আলমে আরওয়ায়ে সফর করছে'। অর্থাৎ পার্থিবতা হতে দূরে অতি উর্ধ্বের মকামে বা স্তরে বিচরণ করছেন। বয়স পঁচিশে থাকাকালীন সময়ে তাঁকে একটি চোগা বা জুব্বা পড়িয়ে দিয়েছেন গাউসুল আযম মাইজভাগুরী (ক.)। তিনি স্বীয় মুর্শিদকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন এবং মুর্শিদও অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এমনকি স্বীয় মুর্শিদ গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর বেসালের পরও সেই ভালবাসার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সর্বদা তাঁর রওজা শরিফে আসার আশ্রয় চেষ্টা করতেন।

একবার নিজ মুর্শিদ গাউসুল আযম মাইজভাগুরীর (ক.) কদম মোবারক দুই হাতে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলেন কোন প্রকারেই ছাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। অতঃপর স্বীয় মুর্শিদ জজবার হালতে চেয়ারের হাতল দ্বারা প্রহার করতে করতে সুন্দর বদনখানি রঞ্জাজ করে দিলেন এবং চেহারার দিকে তজল্লী দিয়ে বলতে লাগলেন "ইউসুফের মত সুন্দর দেখিতেছি, যেন ইউসুফের মত সুন্দর দেখিতেছি"। এমতাবস্থায় তিনি হযরত সাহেবানীর সুপরামর্শে দরবার শরিফ ত্যাগ করে পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর তথা নির্জনতাকে নিত্য সঙ্গী করে ১২ বৎসর কঠোর সাধনার পর দরবার শরিফে স্বীয় মুর্শিদের ওফাতের ষষ্ঠ মাসে আশাঢ়ের বর্ষায় সাম্পানযোগে ফিরে আসেন। এত কষ্টের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল স্বীয় মুনিবের প্রেমের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সন্তুষ্টি অর্জন করা। যদিও মানুষের কাছে এই কষ্ট ভয়াবহ ছিল কিন্তু তাঁর কাছে চুল পরিমাণও কষ্ট মনে হল না।

তাই তো ইমাম গাজ্জালী লিখেছেন, বাগদাদের বাজারে এক ব্যক্তিকে হাত-পা বেঁধে কেটে দিল। কিন্তু সে কাঁদল না বরঞ্চ হাসছিল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, ‘তোমাকে এত আঘাত করার পরও না কেঁদে হাসছ কেন?’ সে উত্তর দিল, ‘ঐ সময় বন্ধুর দর্শনে বিভোর ছিলাম, আমি সামান্যতম কষ্টও অনুভব করি নি’।

গাউসুল আযম বিল বিরাসত মওলানা শাহ সূফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারীকে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী আদর করে ‘বাচা ময়না’ বলে ডাকতেন। তিনি গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) খলিফায়ে আযম ও তুরিকায় মাইজভাণ্ডারীয়ার দ্বিতীয় মহান শায়খ এবং তুরিকার অন্যতম প্রচারক ছিলেন। তিনি ‘কুতুবুল আকতাব’ এবং ‘গাউসুল আযম বিল বিরাসত’ সুলুকের অলিউল্লাহ ছিলেন। তিনি আপন মুর্শিদের প্রতি যে ভালবাসা প্রদর্শন করেছেন তা তুরিকত জগতে উদাহরণ হিসেবেই থাকবে। নিঃসন্দেহে তিনি গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) অন্যতম কারামতও বটে। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর অন্যান্য খলিফাগণের নিকটও গাউসুল আযম বিল বিরাসত মওলানা শাহ সূফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.) ছিলেন অকৃত্রিম ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার স্থল। আল্লামা মকবুলে কাঞ্চনপুরীর ‘আয়নায়ে বারী ফি তরজুমাতি গাউসিল্লাহিল আযম মাইজভাণ্ডারী’তে (২ বার), আল্লামা ফরহাদাবাদীর ‘আত তওজিহাতুল বহিয়্যাহ ফি-তরতিদে মা-ফিত্ত তানকিহাতিস সুন্নিয়াহ’ এবং আল্লামা মন্দাকিনীর ‘প্রেমের হেম’ কিতাবে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। তাঁর অত্যন্ত স্নেহের কনিষ্ঠা শাহজাদী সৈয়দা সাজেদা খাতুনকে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর অছি ও গদিনশিন মওলানা শাহ সূফি হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) নিকট বিবাহ প্রদান করে তদীয় পীর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) পরিবারের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন নিশ্চিত করেন। কিংবদন্তি আছে, এই বিবাহ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) বরকতময় ইশারায় হয়েছিল। তিনি অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পীরে তাফায়ুজ ছিলেন। উল্লেখ্য, শেষ জীবনে প্রায় ২৩ বছর যাবৎ নিজ জবানকে নির্বাক করে রেখেছিলেন তিনি। অবশেষে অসংখ্য কারামতের সেই কেন্দ্র ১৯৩৭ সালের ৫ এপ্রিল মোতাবেক ২২ চৈত্র বেসালপ্রাণ্ড হন।

॥ ২ ॥

ইমামে শাহানশাহ্ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) পবিত্র গৃহে ১৮৯৩ সনের ২৭ ফেব্রুয়ারি মোতাবেক ১৩ ফাল্গুন শাহজাদায়ে গাউসুল আযম বেলায়তে মাআব হযরত মওলানা শাহ সূফি সৈয়দ ফয়জুল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) দ্বিতীয় সন্তান গুভাগমন করেন। ঋতুরাজ বসন্তে কোকিলের মোহিনী সেই ডাক এবং ফুলের পবিত্র সৌরভ যেন বরণ করে নিল তাঁকে। পবিত্র জন্মের পর শ্রদ্ধাস্পদ দাদার গাউসুল আযমিয়্যতের তজল্লির অবয়বই প্রথম দেখেন তিনি। ঠিক মওলা আলী কাররামাল্লাহ্ ওয়াজহাহ্‌র ন্যায়। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী পবিত্র জবানে শিশুর নাম রাখলেন ‘দেলাওর হোসাইন’ অর্থাৎ ‘উত্তম সেনাপতি’। এই নামেরও রয়েছে বিশেষ মহিমাকীর্তন। ‘হোসাইন’ শব্দটি মহানবী (দ.)’র প্রাণাধিক স্নেহের নাতি

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)’র নামের সদৃশ। একদিন গাউসে পাকের ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ হাসেম সাহেব ভোর বেলায় বড় নাতি সৈয়দ মীর হাসান মাইজভাণ্ডারীকে ঘুম থেকে উঠাতে একটু অমাধুর্য ভাষায় ডাকায় গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) বললেন, ‘মিঞা! রাসূলুল্লাহ (দ.)’র দুইজন নাতি হাসনাইনকে (হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন) চিন না? আদবের মোকাম, আদব করিও’। অর্থাৎ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) দুই নাতি সৈয়দ মীর হাসান ও সৈয়দ দেলাওর হোসাইন হযরত রাসূল করিম (দ.)’র দুই নাতি ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রা.)’র প্রতিচ্ছবি। আর ‘দেলাওর’ শব্দটি গাউসে পাকের পীরে তাফায়ুজ হযরত দেলাওর আলী পাকবাজ (ক.)’র নামের অনুরূপ। বস্তুত উক্ত নামের নিগূঢ় মমার্থ তো এই যে, তিনি গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর তুরিকা তথা মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকাকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সর্বপ্রকার প্রতিকূল পরিস্থিতির অশুভ প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে আগলে রাখবেন এবং বাস্তবিক ও ঐতিহাসিক বিচারে প্রতীয়মান যে, তিনি তা রেখেছেনও বটে। উল্লেখ্য, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁকে ডাকতেন ‘দাদা ময়না’ বলে। পাঁচ বছর বয়সে দাদা গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর নিকটই দাদা ময়না তথা শিশু দেলাওর হোসাইনের হাতেখড়ি। সূচনা হয় তাঁর শিক্ষা জীবন। দাদার গাউসুল আযমিয়্যতের তজল্লিতে উজালা গৃহটিই ছিল তাঁর শৈশবকালীন অধ্যয়নের প্রতিষ্ঠান। গৃহ শিক্ষকের হাতে এবং চট্টগ্রাম মোহসেনিয়া মাদ্রাসা থেকে তিনি আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি মাত্র ১৭ দিনে বাংলা শিখে প্রায় ১২ টি বই বাংলা ভাষায় ‘সাধুরীতিতে’ রচনা করেন। তাঁর জীবনরূপী পুস্তকে সে এক অলৌকিক অধ্যায়। বাংলা শিক্ষক ১৭ তম দিবসে পড়ানোর সময় তাঁকে প্রহার করার জন্য উদ্যত হলেন। এমন সময় দাদা গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং দৃশ্যটি তাঁর নজরে আসলে তিনি সাথে সাথে বলে উঠলেন, ‘মোয়াল্লেম কা কাম হয়্যা আদব শিখানা, মারনা নেহি। আপ চল যায়ী, হামারী দাদা ময়না কো মাই পড়াউঙ্গা। ‘অর্থাৎ’ শিক্ষকের কাজ হলো আদব শিখানো; মারধর করা নয়। আপনি চলে যান। এখন থেকে আমার দাদা ময়নাকে আমিই পড়াবো’। এরপর থেকে তিনি আর কখনো কোন শিক্ষকের কাছে বাংলা পড়েন নি। তিনি কুরআন, হাদিস, ফিকাহ্, বালাগাত ও দর্শনশাস্ত্র ইত্যাদি জ্ঞানেও যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেন।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁকে অতীব ভালবাসতেন- এক কথায় অতুলনীয়। তাঁকে ছাড়া কখনো তিনি খাবার গ্রহণ করতেন না; সব সময় সাথে নিয়ে খাবার গ্রহণ করতেন। ছোটকালে নানার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে একদিন থেকে যাওয়ায় গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) খাবার গ্রহণ করেন নি। তাঁর সামনে খাবার পরিবেশন করা হলে তিনি বলেন, ‘খানা নিয়া যাও, দাদা ময়না আসিলে এক সাথে বসিয়া খাইব’। এরপর থেকে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) আর কোথাও বেড়াতে যান নি। এ অগাধ ভালোবাসার আরেকটি বহিঃপ্রকাশ প্রসঙ্গত উল্লেখের দাবীদার। দাদা ময়না দেলাওর হোসাইন একদিন খেলাচ্ছলে বাড়ির আঙিনায় আল্লামা আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরীর ‘ইয়া গাউসে মাইজভাণ্ডার মুজহে শরবত

পিলাদো, তিষ্ণে গিয়ে দিলকো মেরে আজ ভোজাদো'- শে'রটি গাচ্ছিলেন। তখন গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরী (ক.) গদি শরিফে বসা ছিলেন। খাদেমকে আদেশ করলেন 'দুধের শরবত বানাও'। অতপর দাদা ময়নাকে ডাকা হলে তিনি লজ্জাবনত অবস্থায় গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরীর (ক.) সামনে উপস্থিত হন। গাউসে পাক হেসে হেসে বলতে লাগলেন, 'দাদা ময়না, শরবত খাবেন?'। অতঃপর শরবতের পাত্র থেকে তিনি নিজেও পান করলেন, তাঁকেও পান করিয়ে দিলেন। এরপর বাকীগুলো উপস্থিত মানুষের মাঝে বন্টন করে দিতে বললেন। একটি মহা তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হযরত অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরীর দাদীজান তাঁকে প্রায় বলতেন, 'তুমি তো জয়নাল আবেদীন। তোমাকে তো হযরত (গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরী) কারবালা প্রাপ্তরের মৃত্যুর কবল হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন'। বিভিন্ন সময়ে গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরী (ক.) বিশ্ববাসীর সামনে তাঁর পুত্র বংশীয় একমাত্র আউলাদ দাদা ময়না তথা অছির শান-আযমত প্রকাশের জন্য এ ধরনের রূপক কালাম (বাণী) করেছেন বলে প্রতীয়মান। ধীরে ধীরে রহস্যময়, তাৎপর্যপূর্ণ বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরী (ক.) তাঁর দাদা ময়না সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাঞ্জরীকে (ক.) স্বীয় বেলায়তের বাগানের নবাব, সুলতান, উত্তম সেনাপতি, জাগতিক-আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী তথা 'অছি' হিসেবে তিলে তিলে গড়ে তোলেন। গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরী (ক.) বেসালের কিছুদিন আগে তাঁকে নিজ গদীর 'উত্তরাধিকারী' ঘোষণা করেন "দেলা ময়নাই আমার গদীতে বসিবে।" এরপর থেকে হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাঞ্জরী (ক.) 'অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরী' লক্বে অধিক পরিচিত হয়ে উঠেন।

বলা বাহুল্য, হুজুর গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরীর খলিফায়ে আযম গাউসুল আযম বিল বিরাসত মাওলানা শাহ সূফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাঞ্জরী (ক.) প্রকাশ বাবা ভাঞ্জরীরও যুগপৎ উত্তরাধিকারী ছিলেন হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাঞ্জরী (ক.) তথা অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরী। বাবাভাঞ্জরী তাঁকে অতিশয় স্নেহ করতেন এবং অত্যধিক ভালবাসতেন। গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরীর একটি রূপক কালাম আছে 'আমার দেলা ময়না আমার বাচা ময়নার চেহারার উপরে থাকিবে'। ১৯১৬ সাল। বাবাভাঞ্জরী তাঁর নিজ স্নেহের দ্বিতীয় শাহজাদীকে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরীর সাথে বিবাহ দেন। হযরত বাবাভাঞ্জরীর নিকট হতে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরী রুহানি ফয়েয এবং ইলম অর্জন করেন। ১৯২৪ সালে আশুন লেগে দরবার শরিফের ঘর বাড়ি পুড়ে যাওয়ায় অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরীর (ক.) মাটির গুদামে তাঁর পালঙ্কের উপর বাবাভাঞ্জরী তশরিফ আনেন। এতে পরস্পরের রুহানি সম্পর্ক গভীর থেকে আরো গভীরে উপনীত হয়। ময়নাকে যা শিখানো হয় ময়না তা-ই বলে; প্রকাশ করে। হযরত অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরী (ক.) গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরীর (ক.) সান্নিধ্য সবচেয়ে বেশি পেয়েছেন, সবচেয়ে কাছ থেকে উপলব্ধি করেছেন তাঁকে। আর যেহেতু গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরী (ক.) জীবদ্দশায় কোন কিতাব লিখে যান নি এবং তাঁর খলিফায়ে আযম ও দরবার শরিফের

দ্বিতীয় শায়খও (হযরত বাবা ভাঞ্জরী) কোন কিতাব লিখে যান নি সেহেতু গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরীর (ক.) নীতি-আদর্শ, শিক্ষা, তুরিকা, দর্শন ও শান-আযমত তথা তাঁর তুরিকা তুরিকায় মাইজভাঞ্জরীর স্বরূপ উন্মোচন পূর্বক তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার এ গুরু দায়িত্ব স্বয়ং গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরী (ক.) কর্তৃক অর্পিত হয় অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরীর (ক.) উপরই। তাছাড়া স্মর্তব্য, তিনি ছিলেন গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরীর (ক.) (পুত্র বংশীয়) একমাত্র আউলাদ, (তাঁরই সম্বোধিত) দাদা ময়না, নবাব, সুলতান এবং (তাঁরই মনোনীত) অছি, গদিনশীন, খলিফায়ে খাস তথা জাগতিক-আধ্যাত্মিক সূত্রে তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী। অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরী (ক.) কর্তৃক লিখিত-প্রকাশিত গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরীর সেই নীতি-আদর্শ, শিক্ষা, তুরিকা, দর্শন ও শান-আযমতের অনুকূলে খোলাফায়ে কিরামও কিতাবাদি লিখেছেন বিভিন্ন ভাষায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরীর (ক.) খলিফাগণ হযরত অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরীকে (ক.) অত্যধিক ভালবাসতেন। এর অন্যতম বাহ্যিক প্রমাণ, খলিফায়ে গাউসুল আযম আল্লামা আমিনুল হক হারবাংগীরির ওফাতনামা গ্রন্থে "হজরতের নাতি সাহা দেলাওয়ালের কাহিনী", খলিফায়ে গাউসুল আযম আল্লামা বজলুল করিম মন্দাকিনীর প্রেমাঞ্জলি গ্রন্থের "৩৭ নং গানের মধ্যকার ভূয়সী প্রশংসা" এবং খলিফায়ে গাউসুল আযম আল্লামা আবদুল গনি কাঞ্চনপুরীর "আয়নায়ে বারী ফি তরজুমাতি গাউসিল্লাহিল আযম মাইজভাঞ্জরীতে তাঁর নাম মোবারক অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যপূর্ণ ও সম্মানের সাথে উল্লেখ করা" ইত্যাদি।

সামাজিকভাবে হযরত অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরী (ক.) সমাজের প্রত্যেক স্তরে বিচরণ করেছেন। তিনি ১৯১৬ সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে নিজের চার কানি চাষযোগ্য জমি বন্ধক রেখে চাড়ালিয়াহাট আহমদিয়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অতপর ১৯৪৩ সালে ভাঞ্জর শরিফ প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা, পোস্ট অফিস প্রতিষ্ঠা, নাজিরহাট স্টেশনে যাত্রী ছাউনি প্রতিষ্ঠা, বাজার প্রতিষ্ঠা, এলাকার সিএভি রাস্তা, বিদ্যুৎ, পানির সেচ স্কিমসহ বিভিন্ন দুর্ভিক্ষে সহযোগিতা করেন। তুরিকত জগতেও নীতি বিরোধী কাজকে পরিবর্তন করেন দৃঢ় হাতে। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরীর দাদা ময়নার কার্যক্রমের এই সার্বিক ধারা এখনো তাঁর রক্ত ও বেলায়তের যোগ্য উত্তরসূরি হযরত শাহসূফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাঞ্জরীর (ম. জি. আ.) মাধ্যমে যুগোপযোগীভাবে বহমান আছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখার মাধ্যমে তুরিকত জগতে এক সোনালী অধ্যায়ের এই নির্মাতা (হযরত অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরী (ক.) ১৯৮২ সালের ১৯ জানুয়ারি মোতাবেক ২ মাঘ ১৩৮৮ বাংলায় বেসালপ্রাপ্ত হন। পরিশেষে গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরীর 'বাচা ময়না' ও 'দাদা ময়না'র নীতি-আদর্শকে আমরা নিজেদের মধ্যে যাতে ধারণ করতে পারি এই ফরিয়াদই রাখছি মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে বাচা ময়নার মহান ২২ চৈত্র উরস শরিফকে উসিলা করে। আমিন।

শিশু-কিশোর মাহফিল

শ্রদ্ধা: মানুষের অনুপম চরিত্রের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রশ্ন: মহানবী (দ.) তাঁর পবিত্র হাদিস শরিফে ‘শ্রদ্ধা’ বিষয়ে শিক্ষা দিতে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলেছেন কী?

উত্তর: নিশ্চয়ই, সকল প্রশংসা আল্লাহতায়ালার। সোনালী বন্ধুরা সেরকম একটি হাদিস বা মহানবী (দ.) এর পবিত্র বাণী তোমাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। পবিত্র হাদিসে মহানবী (দ.) বলছেন, ‘খায়রুকুম ইসলামান আহসানিকুম আখলাকান ইজা ফাকুহ্।’ সাহাবি বা নবী (দ.) এর সহচর আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (দ.) বলেছেন, ‘ইসলাম ধর্মে অন্তর্ভুক্ত তোমাদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যাদের আচরণ চমৎকার-উৎকৃষ্ট এবং যারা ধর্মকে (ইসলাম) ভালভাবে শিখে আত্মস্থ করেছে।’

প্রশ্ন: মহানবী (দ.) এর পবিত্র জীবন এবং তাঁকে যারা শ্রদ্ধা-মান্য করে একত্ববাদের বিশ্বাসে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের সবার জীবনাচরণ থেকে কী ‘শ্রদ্ধা’ জানানোর পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোনো সুযোগ আছে?

উত্তর: হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছে। মহানবী (দ.) যেমনটি নিজে উৎকৃষ্ট আচরণ এবং ‘শ্রদ্ধা’ জ্ঞাপনের শ্রেষ্ঠ পছাগুলো সাহাবায়ে কেরাম সহচর এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীলদের শিখিয়েছেন, তেমনি যথার্থ জ্ঞানী ও আল্লাহর করুণাপ্রাপ্ত উম্মতগণও ‘শ্রদ্ধা’ জানানোর ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম অনুসরণের চর্চা করেছেন। বিষয়টি বিশ্বাস, অনুশীলন এবং আন্তরিকতার সমন্বয়ে ধীরে ধীরে রপ্ত হয়। মানুষ যেমন শ্রদ্ধার কোনো কিছুকে যাঁর যতটুকু প্রাপ্য সেটুকু দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়, তেমনি একজন মানুষ তার জীবনে সদাচরণ, সদগুণের চর্চার মধ্য দিয়ে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব মানবতার কাছে একজন শ্রদ্ধেয় বা শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য মানুষে পরিণত হতে পারেন।

প্রশ্ন: মহানবী (দ.) এর প্রতি তাঁর সাহাবা বা সহচরগণ নানাভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সেসব নিয়মের মধ্যে একটি নিয়মের কথা কী তুলে ধরা যায়?

উত্তর: নিশ্চয়ই সোনালী বন্ধুরা। মহানবী (দ.) হলেন বিশ্বজগতের জন্য মহান আল্লাহতায়ালার প্রেরিত শান্তি ও করুণার মূর্ত বা দৃশ্যমান প্রতীক। মহান আল্লাহতায়ালার

প্রেরিত ওহিতে তাঁর প্রিয় বন্ধু আমাদের রসূল (দ.) এর প্রতি সুন্দর-সৌকর্যময় ভাষায় সম্বোধন করেছেন। তেমনিভাবে এই সত্য সবার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে যে, রসূল (দ.) এর সাথে কথা বলার সময় তার সুউচ্চ মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে হবে। সেজন্য দেখা যায় আল্লাহর করুণাপ্রাপ্ত একত্ববাদে বিশ্বাসী সাহাবা বা সহচরগণ রসূল (দ.) এর সাথে কথা বলার সময় তাঁদের কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব নিচু করে নিতেন এবং মহানবী (দ.) এর উপস্থিতিতে কেউ কখনো উচ্চস্বরে চিৎকার কিংবা জোরালো শব্দে কথাবার্তা বলতেন না। প্রশ্ন: রসূল (দ.) এর মাধ্যমে মহান আল্লাহতায়ালার রসূল (দ.) এর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং এ বিষয়ে সর্বক্ষেত্রে অনুসরণশীল কোনো শিক্ষা আল্লাহতায়ালার কী দিয়েছেন?

উত্তর: সোনালী বন্ধুরা এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়, মহান আল্লাহ সে শিক্ষা পবিত্র ঐশি বাণী বা ওহির মাধ্যমেও দিয়েছেন। যেমন একদিন সাহাবা হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) রসূলুল্লাহ (দ.) এর উপস্থিতিতে পরস্পর যুক্তিতর্ক করার সময় তাদের কণ্ঠস্বর প্রচণ্ড জোরালো করে ফেলে, ঠিক ঐ সময়ই মহান আল্লাহতায়ালার কিছু আয়াত অবতীর্ণ করে সাহাবা ও মুসলমানগণকে নির্দেশ দেন যে, কোনো মুসলমান যেনো তাদের কণ্ঠস্বর বা মুখগহ্বর নিঃসৃত বাক্যাবলি কথার শব্দের ধ্বনিগত উচ্চতা রসূল (দ.) এর কণ্ঠস্বরের ধ্বনিগত উচ্চতার উপরে নিয়ে না যায়। বরং মহানবী (দ.) এর পবিত্র কণ্ঠস্বরের ধ্বনিগত উচ্চতা থেকে নিচে রাখতে হবে। ওহির মাধ্যমে প্রাপ্ত এই আদেশের কথা জানার পর আবু বকর (রা.) এবং ওমর (রা.) তাঁদের এই ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং পরে কখনো এই ভুল তাঁরা আর করেন নি। সুতরাং বন্ধুরা, আমরা আমাদের পিতামাতা, অভিভাবক, শিক্ষক ও বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা করবো। আর শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হলো তাঁদের সামনে জোরে শব্দ করে আমরা কখনো কথা বলবো না। মহান আল্লাহ আমাদেরকে এই আচরণ পালন করার সামর্থ্য দিন।

(সূত্র: আই লাভ ইসলাম, রেসপেক্ট, ইট ইজ মাই ডিউটি অধ্যায়ের ছায়া অবলম্বনে) (সমাপ্ত)

মহামারি করোনা ॥ এবারের হজ ও বিশ্ব পরিস্থিতি

॥ আলোকধারা প্রতিবেদন ॥

মহামারি করোনা ভাইরাসের কারণে এ বছর কোনো দেশ থেকে কোনো হজ যাত্রী পবিত্র হজ পালন করতে সৌদি আরব যেতে পারবেন না। এর আওতায় পড়েছে বাংলাদেশও। এ পরিস্থিতিতে এ বছর নিবন্ধিত ও প্রাক-নিবন্ধিত হজ যাত্রীদের জন্য জরুরি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে বাংলাদেশের ধর্ম মন্ত্রণালয়। ১২ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রবিবার মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় ২০২০ সালে নিবন্ধিত হজ যাত্রীদের নিবন্ধন ২০২১ সালের জন্য বৈধ থাকবে।

এদিকে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়া রোধে এবারের হজে মুযদালিফা, মিনা ও আরাফাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে সৌদি আরব সরকার। সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে (১৩ জুলাই, সোমবার) এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে শাস্তির বিধান জানায়। সে অনুসারে ২৮ জিলক্বদ (১৯ জুলাই) থেকে জিলহজের ১২ তারিখ (২ আগস্ট) পর্যন্ত অনুমতি ছাড়া উল্লেখিত পবিত্র স্থানে প্রবেশ করে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে ১০ হাজার সৌদি রিয়েল জরিমানা করা হবে। দ্বিতীয়বার একই অপরাধ করলে শাস্তি হবে দ্বিগুণ। সৌদি সরকারের বিধি নিষেধ অনুসারে এবার পবিত্র কাবা শরিফও স্পর্শ করতে পারবেন না হজ পালনকারীরা। নামাযের সময় এমনকি তাওয়াফের সময়ও কাবা শরিফ থেকে হজ পালনকারীদেরকে দেড় মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে (খালিজ টাইমস-এর বরাত দিয়ে দৈনিক ইনকিলাব বাংলাদেশ, ১৪/০৭/২০২০)।

উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে প্রায়শঃ হজ বাতিলের ঘটনা ঘটে। বর্তমানের মতোই প্লেগ ও কলেরা মহামারি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্ভোগের কারণে ইতিহাসে হজ বাতিলের ঘটনা আগে বহুবার ঘটেছে।

সৌদি কর্তৃপক্ষের ঘোষণা অনুসারে ১৪৪১ হিজরীতে অর্থাৎ ২০২০ সালের সীমিত আয়োজনে ১০ হাজার লোক নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে এবারের পবিত্র হজ। মহামারির কারণে দেশটিতে অবস্থানরত ১৬০ দেশের বিদেশি এবং সৌদি নাগরিকদের নিয়ে সীমিত পরিসরে পবিত্র হজ পালনের ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির হজ বিষয়ক মন্ত্রী মোহাম্মদ বেনতেন। সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী বলেন, ৬৫ বছরের উর্ধ্বের কেউ হজে অংশ নিতে পারবেন না।

হজ শেষে এবার হাজীদের ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। হজের আনুষ্ঠানিকতা হিসাবে মিনা, মুযদালিফা ও আরাফাতের পবিত্র স্থানগুলোতে ১৯ জুলাই থেকে ২ আগস্ট

পর্যন্ত হাজিরা যেতে পারবেন। হাজিদের জন্য মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক। সৌদি সরকারের স্বাস্থ্য গাইড লাইন অনুসারে (১৪ জুলাই, ২০) হজ যাত্রীদের কোনো গ্রুপে ২০ জনের বেশি থাকা যাবে না। সবাইকে অন্ততঃ ২ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। মিনা মুযদালিফা ও আরাফাতের ময়দানে প্রত্যেক হাজির জন্য অন্ততঃ ৯ মিটার স্থান বরাদ্দ থাকবে। হজ যাত্রীদের জন্য বরাদ্দ ৪৯ আসনের ৪০টি বাসের প্রতিটি ২২জন যাত্রী চলাচল করতে পারবেন। হাজিদের শনাক্ত করতে প্রত্যেককে একটি করে স্মার্ট কার্ড দেওয়া হবে। হজের প্রতিটি রোকন স্থলে পর্যাপ্ত পরিমাণ জমজমের পানি দেওয়া হবে। এবার কাবা শরিফ স্পর্শ, হযরে আসওয়ায়ে চুমু দেওয়া যাবে না। নির্দিষ্ট দূরত্বে থেকে তাওয়াফ ও সাযি সম্পন্ন করতে হবে। তাওয়াফের সময় হাজিদের মধ্যে দেড় মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। নামাযের সময়ও অনুরূপ দূরত্ব রাখতে হবে। (হজ গাইড, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ জুলাই'২০)।

বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে মার্চের প্রথম সপ্তাহে। করোনা মহামারির কারণে সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থা ২০২০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ৫/৬ মাস বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই সংক্রমণের কোনো সুনির্দিষ্ট ওষুধ বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা (হু) জুলাই '২০ পর্যন্ত দিতে না পারায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। দেশে দেশে ভ্যাক্সিন আবিষ্কারের ট্রায়াল চললেও মধ্যজুলাই ২০২০ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট খবর মিলেনি। সর্বশেষ সংক্রমণের শিকার প্রায় ১২০টির মতো দেশ।

দৈনন্দিন মৃত্যু, আক্রান্ত ও আরোগ্যের পরিসংখ্যান আসতে থাকে সংবাদ মাধ্যমে। সে অনুসারে ১৩ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দের পরিস্থিতি ছিলো : সারা পৃথিবীতে আক্রান্ত ১৩০৫৪৫৮০, মৃত্যু ৫৭১৯০৯, সুস্থ ৭৫৯৮৬৭২। একই তারিখে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ছিলো: আক্রান্ত ১৮৬৮৯৪, মৃত্যু ২৩৯১, সুস্থ হয়ে উঠে ৯৮৩১৭।

অবশ্য জুলাই মাসের শুরুতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিস্থিতি ইতিবাচক হয়ে উঠে। মৃত্যু ও সংক্রমণ কমে আসতে থাকে। ল্যাটিন আমেরিকায় চলছিলো গুরুতর অবস্থা। স্বাস্থ্যবিধি মেনে মানব জীবনের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ফিরিয়ে আনতে চলছিলো সতর্ক প্রচেষ্টা।



১৭ জানুয়ারি ২০২০ নাসিরাবাদ সরকারি (বালক) উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে 'মাইজভাণ্ডারী একাডেমি' আয়োজিত 'ত্রয়োদশ শিশু-কিশোর সমাবেশ'।



১৮ জানুয়ারি ২০২০ জমিয়তুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদ কমপ্লেক্স-এ 'মাইজভাণ্ডারী একাডেমি' আয়োজিত 'উলামা সমাবেশ'।



২০ জানুয়ারি ২০২০ 'এস জেড এইচ এম বৃত্তি তহবিল' আয়োজিত ২০১৯ পর্বের মেধাবৃত্তির ১ম পর্যায়ে ১৬ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধি সহ স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার ১২৫ জন শিক্ষার্থীকে ৫ লক্ষ টাকার বৃত্তির নগদ অর্থ ও সনদ প্রদান করা হয়।



১৪ জানুয়ারি ২০২০ 'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট' নিয়ন্ত্রণাধীন মহিলাদের আত্নজিওগাসা ও জ্ঞানানুশীলনমূলক সংগঠন 'আলোর পথে' আয়োজিত 'মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকায় আত্ননির্ভরশীলতা' শীর্ষক মহিলা মাহফিলে বক্তারা।



২৫ জানুয়ারি ২০২০ ভোরবেলা 'আমি বিশ্বমানবতার সেবক' স্লোগান সম্বলিত টি-শার্ট পরিহিত স্বেচ্ছাসেবীগণ মাইজভাণ্ডার শরিফ প্রধান সড়ক হতে গাউসিয়া আহমদিয়া মনজিল, গাউসিয়া রহমান মনজিল সহ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর কিংবদন্তির রওজা পুকুরের চার পাশে 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কর্মসূচি'তে অংশ নেন।



শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত বহুমাত্রিক কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

০১. মাদ্রাসা-ই-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী, মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
০২. উম্মুল আশেকীন মুনওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হিফযখানা, মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
০৩. গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী ইসলামিক ইনস্টিটিউট (দাখিল), পশ্চিম গোমদভী ৯নং ওয়ার্ড, বোয়ালখালী, পৌরসভা, চট্টগ্রাম।
০৪. গাউসিয়া কলন্দরীয়া নঈমীয়া মাদ্রাসা হেফজখানা ও এতিমখানা, বেতছড়ি ১নং ওয়ার্ড, ১৩নং ইসলামপুর, ঠাণ্ডাছড়ি, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
০৫. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) স্কুল, শান্তিরদ্বীপ, গহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
০৬. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী হিফযখানা ও এতিমখানা, হামজারবাগ, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম।
০৭. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ইসলামি একাডেমি, হাইদগাঁও, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
০৮. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ইবতেদায়ী ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, সুয়াবিল, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
০৯. বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হাফেজিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা, হাটপুকুরিয়া, বটতলী বাজার, বরুড়া, কুমিল্লা।
১০. মাদ্রাসা শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, মনোহরদী, নরসিংদী।
১১. জিয়াউল কুরআন নূরানী একাডেমি, পূর্ব লালানগর, ছোট দারোগার হাট, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
১২. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, সৈয়দ কোম্পানী সড়ক, ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৩. মাদ্রাসা-ই জিয়া মওলা হক ভাণ্ডারী, পশ্চিম ধলই (রেল-লাইন সংলগ্ন), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৪. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, পাটিয়ালছড়ি, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৫. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী, বৈদ্যরহাট, ভূজপুর, চট্টগ্রাম।
১৬. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, ফতেপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৭. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, খিতাপচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৮. জিয়াউল কুরআন জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, চরখিজিরপুর (ট্যাক্সঘর), বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৯. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, মেহেরআটি, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
২০. জিয়াউল কুরআন সুন্নিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, এয়াকুবদভী, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
২১. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,

চন্দনাইশ (সদর), চট্টগ্রাম।

২২. হক ভাণ্ডারী নূরানী মাদ্রাসা, নূর আলী মিয়ান হাট, ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
২৩. শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরিফ ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, চরখিজিরপুর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
২৪. শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, পশ্চিম ধলই (রেললাইন সংলগ্ন), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
২৫. বাইত-উল-আসফিয়া, মাইজভাণ্ডারী খানকাহ শরিফ, খাদেম বাড়ি (৩য় তলা), বাড়ি # ৪, ব্লক # ক, মিরপুর হাউজিং এস্টেট, উত্তর বিশিল, থানা-শাহ আলী, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প:

- শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) বৃত্তি তহবিল “সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প”:
- হোসাইনী দাতব্য চিকিৎসালয় ও খতনা সেন্টার মাইজভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
- সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ্ (রঃ) দাতব্য চিকিৎসালয় গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ শরিফ, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম
- জামাল আহমদ সিকদার দাতব্য চিকিৎসালয় স্টীলমিল বাজার, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম
- হযরত আকবর শাহ্ (রঃ) দাতব্য চিকিৎসালয় ইস্পাহানী ‘সি’ গেইট, আকবর শাহ্, চট্টগ্রাম
- সৈয়দ ছালেকুর রহমান শাহ্ (রঃ) দাতব্য চিকিৎসালয় ধামাইরহাট, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম
- শাহানশাহ্ হক ভাণ্ডারী (কঃ) দাতব্য চিকিৎসালয় আজিমপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
- সৈয়দ আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী (রঃ) দাতব্য চিকিৎসালয় মানিকপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক সহায়তা প্রকল্প:

- যাকাত তহবিল
- দুস্থ সাহায্য তহবিল
- মাইজভাণ্ডারী আদর্শগত গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্প:
- মাইজভাণ্ডারী একাডেমি
- আলোকধারা বুকস
- মাসিক আলোকধারা

আত্মোন্নয়নমূলক যুব সংগঠন:

- তাজকিয়া মহিলাদের আত্মজিজ্ঞাসা ও জ্ঞানানুশীলনমূলক সংগঠন:
- আলোর পথে
- দি মেসেজ

সংগীত ও সংস্কৃতি চর্চা প্রকল্প:

- মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী
- মাইজভাণ্ডারী সংগীত নিকেতন জনসেবা প্রকল্প:

- দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী, মুরাদপুর মোড়, চট্টগ্রাম।
- দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী ও ইবাদতখানা, নাজিরহাট তেমেহনী রাস্তার মাথা।
- দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী, শান-ই-আহমদিয়া গেইট সংলগ্ন, মাইজভাণ্ডার শরিফ।

বার্ষিক অনুষ্ঠানসমূহে

- ন্যায্যমূল্যের হোটেল (মাইজভাণ্ডার শরিফ), ভ্রাম্যমাণ ওযুখানা ও টয়লেট।